শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

ও

বেদান্ত বচন

প্রকাশক :

শ্রী উমাপদ মিত্র

রোড নং ৮/এ

রাজেন্দ্রনগর

পাটনা-৮০০০১৬

মূল্য : ৬ টাকা

মুদ্রক :

তপন প্রিন্টিং প্রেস

আর্যকুমার রোড

পাটনা-৮০০০০৪

নিবেদন

সনাতন ধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার এবং উহার সামগ্রিক রূপ প্রদর্শনের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। সনাতন ধর্মের মূল উৎস বেদের জ্ঞানকাণ্ড অথবা উপনিষৎ সমূহ। উপনিষৎসকল বেদের শেষ ভাগে থাকায় উহাদিগকে বেদান্ত বলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রবর্তিত কালোপযোগী ধর্মের স্বরূপ অবধারণের জন্য তাঁর উক্তিসমূহের সহিত বেদান্ত-বাক্যসকলের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে। ধর্মানুরাগী সুধী ব্যক্তিগণের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার এই সামান্য প্রয়াস। কোনও উদারচেতা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি এই বিষয় অবলম্বনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন তাহলে আমার চেষ্টা সার্থক হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নানা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁর উক্তিগুলির উৎস নির্ণয়ের জন্য এই পুস্তকে ভাগ খণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করা হয় নাই; কেবল যে তারিখে উক্তিটি কথিত হয়েছে সেই তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পুস্তক মুদ্রণে যে সকল শব্দে "বর্গীয় ব" ব্যব-

হার করা উচিত, তা করা সম্ভব হয়নি। এই ত্রুটির জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

কুমারী বীথিকা সরকার প্রেসে ছাপতে দেওয়ার জন্য আমার লেখার প্রতিলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তিনি এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনও করেছেন।

তপন প্রিন্টিং প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রী নিশীথ কুমার বসু মহাশয় এই বই ছাপাবার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। এই সহায়তার জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

বুদ্ধ পূর্ণিমা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৭

স্বামী বেদান্তানন্দ

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

পরমহংস জানে, এসব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্য ! সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য । সব শক্ত দূরের কথা।

(কথামৃত—17-6-83)

পরমহংস তিন গুণের অতীত। তার ভিতর তিন গুণ আছে, আবার নাই। ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। ......পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না।

(কথামৃত, —17-6-83)

পরমহংস কাকে বলি। যিনি হাঁসের মতো দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে মিশে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।

(কথামৃত, 27-12-83)

পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা, এই সব কর্ম। ঐ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ

করে করে লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্বদা স্মরণ মনন থাকে। (কথামৃত, 2-2-1884)

পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে,—কোথায় যাচ্ছে, কোথায় চলেছে, হিসাব নাই। ......

(কথামৃত, 3-7-1884)

নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু' পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয় কাছে আসতে দেয়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে ভাল লাগে। ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

(কথামৃত—11-10-1884)

পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপুসার—'আমার হলেই হলো।' যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচ জনকে দেয়। কেউ পাত-কুয়া খোঁড়ার সময় ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঐ পাতকুয়াতেই ঝুড়ি কোদাল ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয়। যদি পাড়ার লোকের কারও দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন।

(কথামৃত—14-12-1884)

পরমহংসের সর্বদা এই বোধ—ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। (কথামৃত—25-2-1885)

বেদান্ত বচন

জাবাল উপনিষদের ষষ্ঠ খণ্ডে পরমহংসের লক্ষণ ও আচরণের বর্ণনা আছে। পরমহংসের কোন বাহ্য লক্ষণ থাকবে না; তাই তাঁকে দেখে তিনি গৃহী বা সন্ন্যাসী বোঝা যাবে না। তিনি সামাজিক বিধি নিষেধের দাস হবেন না। পাগল না হলেও তাঁর ব্যবহার দেখে তাঁকে পাগল বলে মনে হবে। তিনি ব্রহ্মচারীর ও সন্ন্যাসীর সব চিহ্ন ত্যাগ করে কেবল আত্মচিন্তায় রত থাকবেন। তিনি উলঙ্গ থাকতে পারেন, যেখানে থাকার স্থান মেলে সেখানে থাকতে পারেন। তিনি কোন জিনিষকে 'আমার' বলে' মনে করেন না। কোন অসৎ কর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

আরণ্যক উপনিষদে পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর আচরণের বর্ণনা আছে। তিনি ভূমির উপর বসবেন এবং শয়ন করবেন। তিনি মাটির পাত্র অথবা লাউয়ের বা কাঠের কমণ্ডলু ব্যবহার করবেন। দুই হাতে যতটা ধরে ততটা খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করবেন এবং সবটা খাবেন; কিছু সঞ্চয় করবেন না।

পরমহংস উপনিষদে পরমহংস সন্ন্যাসীর লক্ষণ এবং আচরণ বর্ণিত হয়েছে। পরমহংস সন্ন্যাসী শিখা, উপ-

বীত, দণ্ড, পরণের কাপড় ত্যাগ করবেন। তিনি শীতে গ্রীষ্মে কাতর হবেন না। সুখ দুঃখ মান অপমানের ব্যাপার ঘটলে তিনি চঞ্চল হবেন না। তিনি নিন্দা, গর্ব, দম্ভ, ঈর্ষা, কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি ত্যাগ করবেন। তিনি সংশয়, বিপরীত জ্ঞান এবং মিথ্যা জ্ঞান উৎপত্তির কারণ সকল ত্যাগ করবেন এবং সর্বদা সমস্ত আত্মার স্বরূপ চিন্তায় রত থাকবেন।

জ্ঞান

বেদান্ত বচন

কঠোপনিষদের ১/৩/১৩ মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনার ক্রমগুলি বলা হয়েছে। বিচারশীল সাধক বাগিন্দ্রিয়কে সংকল্প-বিকল্পকারী মনে লয় করবেন। এখানে বাগিন্দ্রিয় বলতে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে লয় করবেন। বুদ্ধি হচ্ছে প্রকাশ স্বরূপ। বুদ্ধি মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে ব্যাপ্ত থাকে বলে বুদ্ধিকে জ্ঞানআত্মা বলা হয়েছে। এই বুদ্ধিকে বিশ্বসৃষ্টির সর্বপ্রথম প্রকাশ মহৎ তত্ত্বে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভে লয় করবেন। অর্থাৎ সাধক নিজের বুদ্ধিকে, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিরূপ উপাধি যেমন নির্মল, সেইরূপ নির্মল করবেন। (সাধনার শেষ স্তর হচ্ছে), উক্ত প্রকার স্বচ্ছ বুদ্ধিকে শান্ত-আত্মায় লয় করবেন। শুদ্ধ আত্মার বা ব্রহ্মের শান্ত এই বিশেষণ দিয়ে বলা হচ্ছে—শুদ্ধ আত্মা সকল প্রকার বিশেষভাব রহিত, তাঁতে কোন বিকার উৎপন্ন হয় না, উহা সকলের অন্তরে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে বর্তমান।

কঠোপনিষদের ২/৩/১০ মন্ত্রে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের অনুভব হয় বলে সেগুলি 'জ্ঞানানি'। জ্ঞান সকল বলা হয়েছে। মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ,—যে অবস্থায় পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল বর্তমান থাকলে সে সকল গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে, যখন মনেও কোন (ইহা করব অথবা করব না, এই রকম) সংকল্প বিকল্পের উদয় হয় না, এবং বুদ্ধি বৃত্তিও তার কাজ করে না, সাধকের সেই অবস্থাকে জ্ঞানীগণ শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলে থাকেন।

মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের ১ম খণ্ডের নবম মন্ত্রে 'জ্ঞানময়ং' পদটি আছে। মন্ত্রটির অর্থ—অক্ষর ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, তিনি সাধারণভাবে সবকিছু জানেন। আর বিশেষভাবে সব জানেন, তাই তিনি সর্ববিৎ। সাধারণ তপস্যায় শারীরিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর্বজ্ঞ থাকাই ব্রহ্মের তপস্যা। সত্ত্বগুণ প্রাধান্য মায়ার জ্ঞানাংশকে ব্রহ্মের উপাধি বলে যখন ভাবা হয় তখনই তিনি সর্বজ্ঞরূপে প্রকাশ পান। এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে কার্যব্রহ্ম (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা), বস্তু বা ব্যক্তির নামসমূহ, বস্তুসকলের শ্বেত, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ, জীব সকলের খাদ্যবস্তু, সকল উৎপন্ন হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের ১ম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে,—কেবলমাত্র 'জ্ঞান প্রসাদেন' জ্ঞান

প্রসাদের দ্বারা অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা মানুষের জ্ঞান লাভ হয় সেই শুদ্ধ হলে তবে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়। সমস্ত মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ—চক্ষু দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না, অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না। তপস্যা দ্বারা নানা প্রকার অসাধ্য সাধন করে; কিন্তু তপস্যা দ্বারাও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। বৈদিক অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মের দ্বারা বিবিধ ফল লাভ হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। মনের সকল প্রকার চাঞ্চল্য যখন দূর হয়, বুদ্ধি যখন নির্মল হয়, সেই শুদ্ধ চিত্তে ধ্যানের ফলে ব্রহ্মানুভব সম্ভব হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫ম মন্ত্রে যে প্রকার সাধনা দ্বারা যেভাবে ব্রহ্মানুভব করেন তাহা বলা হয়েছে। তাঁরা 'জ্ঞানতৃপ্তাঃ'। সাধারণ মানুষ বিষয়ভোগে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকগণ কেবলমাত্র জীবজগতের প্রকৃত স্বরূপ জানার ফলে তৃপ্তি অনুভব করেন, তাঁরা আত্মার স্বরূপ উপ-লব্ধির ফলে ধন্য; কোন বিষয়ে তাঁদের আসক্তি নাই, তাদের সকল ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে। এই প্রকার সাধকগণ ব্রহ্মাকে সর্বব্যাপীরূপে সকল সময় সর্বত্র অনুভব করেন। এই প্রকার বিবেকী এবং একাগ্রচিত্ত সাধকগণ শরীর নাশের সময়ে ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ২য় মন্ত্রে আছে,—সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ঋষি কপিলকে উৎপাদন করেছিলেন। এই ঋষি কপিল পুরাণে বর্ণিত কপিল মুনি নহেন; কিন্তু কপিল (সোনার ন্যায় দেহের বর্ণযুক্ত) হচ্ছেন হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। ইনি ঋষি, কেননা সমগ্র বেদ ব্রহ্মার অন্তরে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। পরমেশ্বর এই হিরণ্যগর্ভকে জন্মাতে দেখেছিলেন এবং অন্তর (বিশ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়) জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন। এই জ্ঞান হচ্ছে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য।

আলোচ্য উপনিষদের ৬/৮ মন্ত্রে আছে,—পরমেশ্বরের শরীর নাই, কোন ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁর সমান অথবা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তাঁর মায়া শক্তির আদি নাই। সেই মায়া শক্তি হচ্ছে, ‘জ্ঞান-বল-ক্রিয়া’; যে জ্ঞানরূপ বল দ্বারা সৃষ্টি ক্রিয়া চলে, তাহা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১ম বল্লীতে আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম এই তিনটি হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। তিনি সত্যবাদী বলা যায় না। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই একরূপ। তিনি জ্ঞানবান নহেন, কিন্তু নিজে জ্ঞান বা অনুভব স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে সে 'নেতি নেতি' এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয় তখন ব্রহ্ম জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য। (কথামৃত—27-10-1882)

জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের যেখানে শেষ, সেখানে সমাধি হয় আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

(কথামৃত—25-1-1884)

চার-পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহংকার, যার পাণ্ডিত্যের অহংকার, যার ধনের অহংকার তার জ্ঞান হয় না। (কথামৃত—22-10-1885)

জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও; তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান।

(কথামৃত – 27-10-1885)

জ্ঞান পথে যদি কেউ অনাচার করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। ....জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। বিচার করতে করতে ব্যক্তির ভাব কখন কখন এসে পড়ে।

(কথামৃত—5-6-1883)

জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানের লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারও অনিষ্ট করতে পারেনা। বালকের মতো হয়ে যায়। .... বাহিরে হয়তো দেখায় যে, রাগ আছে, কি অহংকার আছে। কিন্তু জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না। ....নেতি নেতি করে' আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। নেতি নেতি বিচার করে' সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায়।

(কথামৃত—5-4-1884)

নরেন্দ্র বললেন, 'খাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছা লাভই ভাল।' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই'।

(কথামৃত—28-9-1884)

ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ....(ঋষিরা) দেখা, শোনা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো। তবে ব্রহ্মকে বোধে-বোধ করতো।

(কথামৃত—3-8-1882)

জ্ঞানী 'নেতি, নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম। জ্ঞানীর স্বভাব জান? জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

(কথামৃত—30-6-1884)

জ্ঞানীর উদ্দেশ্য সূক্ষ্ম রূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরমব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরমব্রহ্ম এক। মায়ার দরুণ জানতে দেয় না।

(কথামৃত—9-11-1884)

জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাঙটা (তোতাপুরী) বলতো। জলে জল, অধঃ উর্দ্ধে পরিপূর্ণ। জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে। ....অনন্ত সমুদ্র, জলের অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটা ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে, অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটা কি? ঘট আছে বলে' জল দুভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। এই আমিটা যদি যায় তা হলে যা আছে তাই আছে মুখে বলবার কিছু নাই।

জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে ডানা বিস্তার করে। চিদাকাশ আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে আনন্দ ধরে না।

(কথামৃত—30-10-1885)

জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে' বোধ হয়,—যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি, এসব বোধ

থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। ....তবে জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এ সব তিনি আছেন বলে' আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না।

(কথামৃত—1-1-1883)

জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশাসন চাই।

(কথামৃত—2-10-1884)

———

বিজ্ঞান

বেদান্ত বচন

কঠোপনিষদের ১/৩/৮ মন্ত্রে 'বিজ্ঞানবান' পদটি আছে। এর অর্থ বিবেকী ব্যক্তি, যার কোন্ কাজ করণীয় এবং কোন্ কাজ করা উচিত নয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে। মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে; ব্যক্তি সদ্‌সৎ বিচারশীল, যাঁর চিত্ত সংযত; যাঁর মনে কখনও অসৎ চিন্তার উদয় হয় না, তিনি সেই পদ লাভ করেন, যার ফলে তাঁকে আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। তিনি মুক্তি লাভ করেন।

মুণ্ডক উপনিষদের ১/২/১২ মন্ত্রের 'বিজ্ঞানার্থং' পদটির অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে জানার উদ্দেশ্যে।

এই উপনিষদের ২/২/৭ মন্ত্রের 'বিজ্ঞানার্থ' পদটি আছে। এখানে পদটির অর্থ, শাস্ত্রের শিক্ষা এবং গুরুর উপদেশের সহায়ে বিশেষভাবে জানার জন্য।

এই উপনিষদের ৩/২/৬ মন্ত্রে 'বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থা' পদ আছে। মন্ত্রটির অর্থ, বিশেষভাবে বেদান্ত আলোচনার ফলে যাঁরা ভালভাবে বুঝেছেন যে উহার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মানুভব, তাঁরা সকল

কর্মত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সাধনা করেন। তাঁরা এই জীবনেই পরমাত্মার সহিত নিজেদের অভেদ-ভাব উপলব্ধি করেন, শরীর নাশের পর আর তাঁদের জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ৫ম অনুবাকের প্রথমে যে শ্লোক আছে তাতে 'বিজ্ঞানং' পদটি তিনবার আছে। এখানে পদটির অর্থ হবে বুদ্ধি। শ্লোকটির অর্থ এইরূপ। —লোকে শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হয়। কেবল যজ্ঞ নয়, বুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ সকল প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে। দেবতা সকল সর্ববুদ্ধির মূলে বর্তমান বিজ্ঞান ব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন। এই বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) যদি জান, আর তাঁর উপাসনায় যদি কোন ভ্রম প্রমাদ না ঘটে, যদি স্থূল শরীরকে আমি বলে মনে না হয়, তা হলে দেহ দ্বারা কৃত সকল অসৎ কাজের ফলভোগ থেকে মুক্ত হয়ে হিরণ্যগর্ভরূপে সকল কাম্য বিষয় উপভোগ করবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে 'বিজ্ঞান' শব্দের কয়েকবার উল্লেখ আছে। এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রের অর্থ বিষয়ক জ্ঞান। প্রথমেই বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোন মন্ত্রের বা দেবতার ধ্যান করতে শাস্ত্র অনুসারে সেই মন্ত্রের বা দেবতার বিষয়ে ঠিক ঠিক জানা দরকার। এই জ্ঞান না

থাকলে ধ্যান সফল হয় না। বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়তার জন্য বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২/৪/৫) যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, "আত্মাকে দর্শন অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ অনুভব করতে হবে। আত্মদর্শনের উপায় হচ্ছে, আত্মার বিষয়ে শাস্ত্র থেকে জানতে এবং গুরুর মুখে শুনতে হবে, শোনার পর সে বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে, মননের পর একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে হবে। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের উৎপত্তি হবে।

পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, (২-৪-১৩) বিজ্ঞাতাকে—যিনি স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ সেই আত্মাকে জানা যায় না। এই বিজ্ঞাতা সর্বত্র সমভাবে বর্তমান আছেন বলেই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অজানা বিষয় সকলকে জানা যায়।

আলোচ্য উপনিষদে বলা হয়েছে (৩/৭/২৩) আত্মা নিজে অবিজ্ঞাত থেকেও বিজ্ঞাতা। আত্মা আছেন বলেই ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় বা মন দিয়ে আত্মাকে জানা যায় না।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বললেন, আত্মা নিজে অবিজ্ঞাত থেকেও বিজ্ঞাতা। (আত্মাকে বিষয়রূপে জানা যায় না; সর্বাত্মভাসক আত্মা থাকার জন্য আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি।) (বৃহদারণ্যক ৩/৮/১১)

ঐ উপনিষদে (৩-৯/১৮/৭) ব্রহ্মকে বিজ্ঞান স্বরূপ বলা হয়েছে। এই বিজ্ঞানের বিনাশ হয় না। জ্ঞান স্বরূপ বিজ্ঞাতা আত্মা থেকে ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় তাঁর জানার কোন বিষয় নাই।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল, বিজ্ঞাতা (বিজ্ঞাতৃ শব্দ) এবং বিজ্ঞান এই দুটি পদ উপনিষদে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর উক্তিসমূহের মধ্যে বিজ্ঞাতা পদটি ব্যবহার করেন নি। 'যিনি বিশেষ রূপে জানেন', বোঝাতে তিনি 'বিজ্ঞানী' পদটি ব্যবহার করেছেন, তাও একটা বিশেষ সীমিত অর্থে। তাঁর মতে আত্মজ্ঞানলাভের পর, যিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন তিনিই বিজ্ঞানী। পরে তাঁর উক্তিসমূহ থেকে দেখা যাবে, তিনি জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

জ্ঞানী 'নেতি করে' বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানী, যিনি বিশেষ রূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। ....'নেতি নেতি' করে' যাঁকে ব্রহ্ম বলে' বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। ....বিজ্ঞানী দেখে, ব্রহ্ম, অটল নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব

সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। বিজ্ঞানী দেখে, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য।

বিজ্ঞান—কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে তার বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সঙ্গে আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

প্রথমে 'নেতি নেতি' করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন বুদ্ধি অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হলে সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু ছাদের উপরে পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিষে ছাদ—ইট চূণ সুরকি—সেই সেই জিনিষে সিঁড়িও তৈয়ারি। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীব জগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন।

বিজ্ঞান হলে সংসারেও থাকা যায়। এখন বেশ অনুভব হয় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন।

(কথামৃত—5-4-1884)

যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দুধ খেয়েছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।

যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করেছে, তাঁর সঙ্গে কথা কচ্ছে (যে বিজ্ঞানী) তার স্বভাব আলাদা; কখনও জড়বৎ, কখনও পিশাচবৎ, কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদবৎ। কখনও সমাধিস্থ হয়ে বাহ্য (জ্ঞান) শূন্য হয়—জড়বৎ হয়ে যায়। সে সবকিছু ব্রহ্মময় দেখে, তাই পিশাচবৎ। শুচি অশুচি বোধ থাকে না। ....হয়তো বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মতো। বিষ্ঠা মূত্র জ্ঞান নাই; সব ব্রহ্মময়। আবার উন্মাদবৎ। তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে পাগল। আবার কখনও বালকবৎ; কোন পাশ নাই; লজ্জা ঘৃণা সঙ্কোচ প্রভৃতি। ঈশ্বর দর্শনের পর এই কাম ক্রোধাদি আর থাকে না।

(কথামৃত—9-3-1884)

নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যে মন (পাশা খেলায়) পাকা খেলোয়াড় ছক বাঁধা খেলতে পারে। কি চাও—ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে। এমনি পাকা খেলোয়াড়। .... বিজ্ঞানীর কিছুতে ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ করেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করেছে। তাঁকে চিন্তা করে' অখণ্ডে

মন লয় হলেও আনন্দ—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে রেখে আনন্দ।

(কথামৃত—30-6-1884)

কারও পায়ে একটা কাঁটা ফুটছে। সে ঐ কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটা কাঁটা যোগাড় করে' আনে। তারপর, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার পর দুটা কাঁটাই ফেলে দেয়। অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা আহরণ করতে হয়। তারপর, জ্ঞান অজ্ঞান দুটা কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটা বোধে বোধ করে', তাঁকে বিশেষভাবে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়.—এরই নাম বিজ্ঞান।

(কথামৃত—23-5-1885)

ওঁকার

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মহিমাচরণের প্রতি)—ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল, অকার উকার মকার। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়;—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিষ পড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হলো; মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আবার ঐতে লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়।

(কথামৃত —26-10-1884)

ওঁকারকে প্রণব বলা হয়। প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তি,—প্র পূর্বক নু ধাতু অল্ প্রত্যয়। নু ধাতুর অর্থ স্তুতি করা। যে মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে প্রকৃষ্ট রূপে স্তব করা হয় তার নাম প্রণব। সেই মন্ত্রটি হচ্ছে ওঁকার।

বেদান্ত বচন

বহু উপনিষদে ওঁকারের উল্লেখ অথবা আলোচনা আছে। মাণ্ডূক্য উপনিষদের অধিকাংশ ওঁকারের আলোচনায় ব্যাপ্ত। এই উপনিষদের প্রথমেই বলা হয়েছে যাহা কোন নামের দ্বারা উল্লেখ করা যায় সেই সমস্ত ওঁকার এই অক্ষর থেকে প্রকাশিত। যাহা কিছু অতীতে ছিল, বর্তমান কালে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে সে সকলেই প্রকাশিত হয়েছিল, হয়েছে বা হবে সে সবই ওঁকার। এ সকলই ব্রহ্ম। আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নাই। আত্মার জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চার পাদ আছে। ওঁকারেরও তিন মাত্রা: অউম। আত্মার চতুর্থ পাদ সম্বন্ধে যেমন মুখে কিছু বলা যায় না, উহা অচিন্ত্য; ওঁকারের চতুর্থ মাত্রা নাই, উহা মাত্রা-রহিত এবং আত্মার সহিত অভিন্ন।

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর বলা হয়েছে, পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা) উভয়ই ওঁকার স্বরূপ। এই কারণে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ওঁকার-রূপ প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, অথবা

এই প্রতীক অবলম্বন করে হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্ত হন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষা বল্লীর অষ্টম অনুবাকে বলা হয়েছে, 'ওম্' এই শব্দকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে। শব্দরূপ ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলে' নামরূপাত্মক জগতের সবকিছু ওঁকার থেকে ভিন্ন নয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডে বলা হয়েছে—কোনও গাছের পাতার সমস্ত অংশ যেমন পাতার মাঝখানের শিরার সহিত সংবদ্ধ থাকে সেইরূপ সকল বাক্য ওঁকারের সহিত সংবদ্ধ। এই সব কিছু ওঁকার থেকে অভিন্ন।

আত্মতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক নচিকেতাকে যম ওঁকারের মাহাত্ম্য এইভাবে বলেছিলেন। (কঠোপনিষদ—১/২/৭) উপনিষৎ সমূহ ব্রহ্মের বিষয়ে বর্ণনা করেন, তাঁকে লাভের জন্য সাধকগণ নানাবিধ তপস্যা করেন। যাঁকে পাওয়ার জন্য গুরু-গৃহ বাস বা ব্রহ্মচর্য পালনের বিধি আছে সেই ব্রহ্মের প্রতীক হচ্ছে ওঁকার। ওঁকার এই অক্ষরটি হচ্ছে ব্রহ্মের প্রতীক, এটি হচ্ছে পরব্রহ্মের বাচক। এই ওঁকার রূপ প্রতীক সহায়ে উপাসনা করে' যিনি পরব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়। আর যিনি অপর-ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে পেতে চান তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম লাভের জন্য ওঁকার হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই প্রতীক অবলম্বনে

উপাসনা করে' সাধক পরব্রহ্ম উপলব্ধি করে, অথবা হিরণ্যগর্ভলোক গমন করে এবং অপরের পূজার পাত্র হয়ে থাকেন।

মুণ্ডক উপনিষদে (২/২/৪) প্রণবকে ধনুকের সহিত তুলনা করা হয়েছে। ধনুক না থাকলে তীর দ্বারা যেমন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ ওঁকার জপ ও ধ্যানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হলে জীবাত্মা ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না। এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে তীরের সহিত তুলনা করা হয়েছে। সকল প্রকার মানসিক চাঞ্চল্য-রহিত হয়ে জীবাত্মাকে প্রণবের সহায়তায় ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে হবে। তীর যেমন লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করে তাতে স্থির ভাবে থেকে যায়, জীবকেও সেইভাবে ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করতে হবে।

সপ্তভূমি

বেদান্ত বচন

বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাতভূমি মনের স্থান। যখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান মনের তখন উর্ধ্ব গতি থাকে না কেবল কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি-হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি! একি!' তখন আর নীচের দিকে মনঃ যায় না। মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মনঃ যার কণ্ঠে উঠেছে, তখন তার অবিদ্যা অজ্ঞান সমস্ত গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মনঃ সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে' উন্মত্ত হয়ে সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতরে আলো আছে। মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম। কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

শিরোদেশ সপ্তভূমি। সেখানে মনঃ গেলে সমাধি হয় আর ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

(কথামৃত—28-10-1982)

মহোপনিষদে সপ্তজ্ঞান ভূমির কথা আছে। সেগুলির নাম—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসী, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা এবং তুর্যগা। এই ভূমি-সমূহের সংজ্ঞা এইরূপ। (১) আমার কি বুদ্ধি স্থির হয়েছে অথবা 'আমি অজ্ঞান' কিছুটা বৈরাগ্য আসার সঙ্গে যখন মনে এই প্রকার ভাবনায় উদয় হয়, শাস্ত্রের এবং সাধু পুরুষগণের উপদেশ থেকে নিজের মানসিক অবস্থা জানার এবং বোঝার আগ্রহ জন্মে তখন সাধনার পথে যাত্রা আরম্ভ হয়। এই প্রথম ভূমির নাম শুভেচ্ছা। (২) শাস্ত্রের উপদেশের এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে যখন সৎভাবে চলার আগ্রহ প্রবল হয়, মনের সেই অবস্থার নাম বিচারণা। (৩) শুভেচ্ছা ও বিচারণার প্রভাবে যখন বিষয়াসক্তি হ্রাস পায় মনের সেই অবস্থাকে বলা হয় তনুমানসী। (৪) এই তিন ভূমিতে থাকার ফলে চিত্ত যখন বিষয় গ্রহণে বিরত এবং স্তব্ধ বা সত্ত্বাত্মায় স্থির হয় সেই ভূমির নাম সত্ত্বাপত্তি। (৫) এই চারিটি সাধনার ফলে যখন মনের সত্ত্বাত্মায় নিশ্চলভাবে স্থিতি স্বাভাবিক হয় সেই পঞ্চম ভূমির নাম অসংসক্তি। (৬) উক্ত পাঁচটি ভূমিতে অবস্থানের ফলে সাধক যখন আত্মারাম হন, যখন জাগতিক রূপরসাদির আকর্ষণ নষ্ট

হয় এবং মনেও সে সকলের চিন্তা উঠে না, যখন অপর ব্যক্তি বহু চেষ্টা করে' সাধকের চেতনা বাহ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণে সমর্থ হয়, তখন সাধক পদার্থভাবনা নামক ষষ্ঠ ভূমিতে আরোহণ করেছেন। (৭) এই ছয় ভূমিতে দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে সাধক যখন আর ভেদদর্শন করেন না এবং সর্বদা আত্মস্বরূপে স্থির থাকেন তখন তিনি তুর্যগা নাম্নী শেষ ভূমিতে আরোহণ করেছেন এবং জীবন্মুক্ত হয়েছেন।

(মহোপনিষৎ, পঞ্চম অধ্যায়)

মন তৃতীয় ভূমিতে উঠলে মানসিক বৃত্তি সমূহ তনু অর্থাৎ ক্ষীণ হয়ে আসে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সংযত হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে মনের বাসস্থান প্রথম তিন ভূমি। অর্থাৎ তৃতীয় ভূমিতে মন উঠলেও সুস্বাদু বস্তু পান ও ভোজনের বাসনা এবং কাম-প্রবৃত্তি কিছু না কিছু থেকে যায়। এই ভাবে বিচার করলে উপনিষদ্ বাক্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর সামঞ্জস্য করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

বেদান্তের সপ্তভূমি এবং যোগশাস্ত্রের ষট্চক্রের সঙ্গে মিল দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আর একদিন ভক্তদের বলে-ছেন,—"বেদান্তের সপ্তভূমি আর যোগশাস্ত্রের ষট্চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি আর ওদের

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে—গুহ্য, লিঙ্গ ও নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পথে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক বলে একি ! একি ! পঞ্চম ভূমিতে মনঃ উঠলে কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়, এখানে বিশুদ্ধ চক্র। ষষ্ঠভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো—ছুঁতে পারে না—কাঁচ ব্যবধান আছে বলে'। ষট্চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি (সহস্রার পদ্ম)। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়; সমাধি হয়। দেহবুদ্ধি চলে যায়, বাহ্যশূন্য হয়; নানা জ্ঞান চলে যায়, বিচার বন্ধ হয়ে যায়।

(কথামৃত—10-6-1883)

———

ব্রহ্ম অবাঙ্‌ মনসো গোচরম্‌

ব্রহ্ম কি জিনিষ, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল—সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ পুরাণ তন্ত্র আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু কেউ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই, তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হননি।

(কথামৃত—22-10-1883)

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে?

(৪/৪০ সৃ০, 22-7-1883)

ব্রহ্ম অবাঙ্‌ মনসো গোচরম্‌—বেদে বলছে এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।

(৫/২৫—26-11-82)

ব্রহ্ম অবাঙ্‌ মনসো গোচরম্‌। জ্ঞান, সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর নির্বিকল্প সমাধি হয়। আবার সেই অনন্ত, বাক্য মনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম।

কঠোপনিষদের ৩/৩/৯ মন্ত্রে আছে ব্রহ্মের রূপ দেখা যায় না; চর্মচক্ষু দিয়া কেহ কখনও দেখতে পায় না। যে মনঃ থেকে সকল সংশয় চলে গিয়েছে, যে মনঃ নিরন্তর ধ্যানে অভ্যস্থ হয়েছে সেই শুদ্ধমনে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি অমর হন অর্থাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

ঐ উপনিষদের ৩/৩/১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, মনঃ দিয়া তাঁকে চিন্তা করা যায় না, চক্ষু দিয়া তাঁকে দেখা যায় না। 'তিনি আছেন, ইহা স্বীকার করা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না! (নাস্তিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্ম না থাকলে তিনিও থাকতেন না।)

কেন উপনিষদের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম থেকে নবম মন্ত্রে বলা হয়েছে,—ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, মন দিয়া তাহা চিন্তা করা যায় না, চক্ষু দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কান দিয়া তাহা শোনা যায় না, প্রাণবায়ু নাসিকার সাহায্যে তাহা আঘ্রাণ করতে পারে না। ব্রহ্ম আছেন বলেই বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণের দ্বারা ভাবপ্রকাশে সমর্থ হয়, মনঃ চিন্তা করতে, চক্ষু রূপ দর্শনে, কর্ণ শব্দ শ্রবণে এবং প্রাণবায়ু নাসিকার মাধ্যমে গন্ধ গ্রহণে সমর্থ হয়।

কেন উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে,—যে ব্যক্তি বলেন ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলে তাঁর বিষয়ে কিছু বলা যায় না, তিনি ব্রহ্ম অনুভব করেছেন ; কিন্তু যিনি বলেন আমি ব্রহ্মকে জেনেছি তিনি জানেন না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (৩/৪/১) উশস্ত চাক্রায়ণ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুরোধ করলেন, 'যিনি অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের অন্তরে বর্তমান, তাঁর বিষয়ে আমাকে বলুন'। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক বললেন, 'তোমার আত্মাই সর্বাপেক্ষা তোমার অন্তরে বর্তমান'। চাক্রায়ণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ বস্তুটি সর্বাপেক্ষা অন্তরে বর্তমান ? যাজ্ঞবল্ক বললেন, সর্বান্তর আত্মাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না। কেননা, দৃষ্টিশক্তির দ্রষ্টাকে কেহ দেখতে পায় না, শ্রবণশক্তির নিয়ন্তাকে শুনতে পাওয়া সম্ভব হয় না, যিনি থাকায় মন চিন্তা করতে সমর্থ হয় মনের সেই নিয়ন্তাকে কেহ চিন্তা করতে পারে না, বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞতাকে জানা সম্ভব নয়। এই আত্মা তোমার সর্বাপেক্ষা অন্তরে বিদ্যমান।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৭/২৩) আরও আছে,—যাজ্ঞবল্ক উদ্দালক আরুণিকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন, তোমার সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকে তোমার অন্তরে থেকে নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই তোমার আত্মা, তাঁর জন্ম-মরণ নাই। তাঁকে দেখা না

গেলেও তিনি সবকিছু দেখেন, তাঁর কথা শোনা না গেলেও তিনি শোনেন, তাঁকে মন দিয়ে চিন্তা করা সম্ভব না হলেও মনের কাজ তিনি আছেন বলেই সম্ভব হয়, তাঁকে জানা না গেলেও তিনিই সব জানেন। তিনি ছাড়া অপর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। তিনি আপনার অন্তর্যামী ও জন্মমরণ রহিত আত্মা।

নৃসিংহ-উত্তরতাপনীয় উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, "অয়মাত্মা অবাঙ্‌মনসো গোচরত্বাদ চিদরূপ"; অর্থাৎ এই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—ইহা চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।

সচ্চিদানন্দ

বেদান্ত বচন

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি শব্দ সন্ধি দ্বারা যুক্ত হলে সচ্চিদানন্দ শব্দটি হয়। সৎ শব্দের অর্থ সত্য। যাহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালে একরূপ থাকে, তাহাই সত্য। চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান।

প্রাচীন প্রধান এগারখানা উপনিষদে সচ্চিদানন্দ শব্দটি অথবা সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ এই তিনটি শব্দ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মের বিশেষণরূপে কোথাও বা দুইটি, আবার কোথাও একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। (২-১-৩) মুণ্ডক উপনিষদে (২-২-৭) আছে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

আলোচ্য শব্দ তিনটির পৃথকভাবে ব্যবহার প্রাচীন উপনিষদ সমূহের বহু স্থলে পাওয়া যায়। 'সচ্চিদানন্দ' এই সংযুক্ত শব্দটি কেবল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত কয়েকটি উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে। মৈত্রী উপনিষদে আছে, "সর্বং পূর্ণব্রহ্ম সোঽহমস্মি সচ্চিদানন্দ-লক্ষণঃ।" তৃতীয় অধ্যায় দ্বাদশ মন্ত্র।

নৃসিংহ উত্তরতাপনীয় উপনিষদে বলা হয়েছে "ব্রহ্ম ইদং সর্বং সচ্চিদানন্দরূপং। সচ্চিদানন্দরূপমিদং সর্বম্। সৎ ইহ ইদং সর্বম্।" (সপ্তম খণ্ড)

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসমূহের মধ্যে সচ্চিদানন্দ শব্দটির বারবার উল্লেখ দেখা যায়। কয়েকটি বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে।

তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জানতে দেন না। কামিনী-কাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে (ঈশ্বর) একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখালেন। 'হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটা পুকুর, আর একজন পানা সরিয়ে জল পান করলো। জলটা স্ফটিকের মত। দেখালে যে সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা; যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।'

(কথামৃত—22শে জুলাই, 1883)

জীব তো সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপায় হয়ে থাকে আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে থাকে।

(কথামৃত, 14-2-1882)

ব্রহ্মই বস্তু আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ, অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়। এ এক ভাগ জল, ও এক ভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

(কথামৃত—5-4-1883)

——

নির্গুণ ব্রহ্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

" যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারও পার; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিন দেহেরই পার; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের পার; সমস্তই মায়া। যেমন, আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে। প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, 'দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বও সত্য বলে' বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে 'সোঽহং' 'আমিই সেই ব্রহ্ম', এই অনুভূতি হয়।

(কথামৃত—25-2-1885)

একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছে। সে একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ-হাতে অস্ত্র-শস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার করছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়াও সত্য নয় সাজগোজ, অস্ত্র-শস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে

আছে। কি না; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—বিচার করতে গেলে কিছুই টেকে না। তবে এ ভ্রমও সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছ। স্বপন ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড় দুড় করছে। ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে, খড়ের মূর্তি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোন মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে, খড়ের মূর্তি। এসে অপরদের বললে, আর ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না। বলে বুক দুড় দুড় করছে। তখন ভূঁয়ে মূর্তিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগল, এ কিছু নয়, এ কিছু নয়। 'নেতি, নেতি'।

(কথামৃত—18-10-1885)

যদি জিজ্ঞাসা কর, ব্রহ্ম কেমন, তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও বলা যায় না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—কেমন ঘি? তার উত্তর,—কেমন ঘি, না যেমন ঘি। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই।

(কথামৃত—30-10-1885)

যে জ্ঞানী, জ্ঞান যোগ ধরে আছে সে 'নেতি নেতি' এই বিচার করে। বিচার করতে করতে যখন মনঃ স্থির হয়, মনের লয় হয় সমাধি হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। নামরূপ

সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নাই।

(কথামৃত—27-10-1882)

বেদান্ত বচন

এই যে আত্মা আছেন তাঁকে 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয় বলা হয়। তিনি অগ্রহণীয়—তাঁকে (বস্তু বা ব্যক্তিরূপে) গ্রহণ করা যায় না। তিনি অক্ষয় কারণ তাঁর ক্ষয় হয় না। তিনি অসঙ্গ, কারণ তিনি কোন কিছুতে আসক্ত হন না। তিনি অবদ্ধ বলে ব্যথা পান না বা নষ্ট হন না। 'এই কারণে পাপ করিয়াছি' 'এই কারণে পুণ্য করিয়াছি'—এইরূপ চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে না। তিনি পাপ বা পুণ্য এই দুয়ের অতীত। কেন এই কাজ করেছি' বা 'এই কাজ করি নাই'—এইরূপ চিন্তা তাঁকে কষ্ট দেয় না।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৪-৪-২২)

এই আত্মার স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, চক্ষুঃ দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না, মনঃ দিয়া তাঁর বিষয়ে চিন্তা করা যায় না, যে আস্তিক ব্যক্তিগণ 'ব্রহ্ম আছেন' ইহা স্বীকার করেন তাঁরা ছাড়া নাস্তিকগণ তাঁকে অনুভব করতে সমর্থ হয় না।

(কঠ. উপ—২-৩-১২)

মুণ্ডক উপনিষদে (১-১-৬) আছে—ব্রহ্মকে চোখে

দেখা যায় না, তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তিনি উৎপন্ন হননি। তাঁর কোন রূপ নাই। তাঁর চোখ, কান, হাত বা পা নাই। তাঁর বিনাশ হয় না। তিনি সর্বত্র আছেন এবং নিজেকে নানারূপে প্রকাশিত করেন; তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম। যাহা কিছু হয়েছে এবং আছে সে সকলের তিনিই উৎপত্তির কারণ। বিচারশীল ব্যক্তিগণ যে বিদ্যা সহায়ে তাঁকে সকল প্রাণীর আত্মারূপে অনুভব করেন সেই বিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলা হয়।

ঈশোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ইনি অচল, এক অর্থাৎ সর্বভূতে সমভাবে বর্তমান, মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। মন কল্পনা দ্বারা যে কোন স্থানে যেতে পারে। কিন্তু মন যেখানেই যাক না কেন, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সেখানে আগে থেকে আছেন। ইন্দ্রিয় সকল মনের তুলনায় জড়, সুতরাং সে সকল সর্বব্যাপী ব্রহ্মের নাগাল কোনরূপেই পেতে পারে না। ব্রহ্ম সর্বদা স্থির থেকেও দ্রুতগামী সকলবস্তুকে অতিক্রম করে চলেন।

কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম থেকে অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে,—বাক্‌শক্তি ও শব্দ যাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যিনি আছেন বলে' বাক্‌-ইন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ করতে পারে; যাঁর স্বরূপ মন চিন্তা করতে অক্ষম, কিন্তু যিনি আছেন বলে' মন চিন্তা করতে পারে; চক্ষু দিয়া যাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু যাঁর

থেকে দর্শনসামর্থ্য পেয়ে থাকে; কান দিয়া যাঁকে শোনা যায় না, কিন্তু কানের শ্রবণ-সামর্থ্যের মূলে যিনি আছেন; ঘ্রাণ শক্তি যাঁকে আঘ্রাণ করতে পারে না, কিন্তু যিনি আছেন বলে' ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ সামর্থ্য লাভ করে, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক ও নিয়ামক তাঁকে ব্রহ্ম বলে জানবে।

কঠোপনিষদের ১/৩/১৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে,—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণের জন্য যাঁর ইন্দ্রিয় নাই, যাঁর কোন রূপ নাই, যিনি সর্বদা এক প্রকার থাকেন, যাঁর আদি বা অন্ত নাই, সেই ব্রহ্মকে নিজের আত্মা বলে অনুভব করতে পারলে মৃত্যু-ভয় চলে যায়।

উদ্দালক আরুণি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্তর্যামী ব্রহ্মের বিষয়ে জানতে চাইলে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন, 'যিনি তোমার সকল ইন্দ্রিয়ে বর্তমান থেকে সকলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তোমার আত্মা; তিনি অন্তর্যামী এবং জন্মমরণহীন, তাঁকে কেহ দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সব কিছু দেখেন। তাঁকে শোনা না গেলেও তিনি সব শোনেন। চিন্তা করে তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও সকল মননক্রিয়ার পশ্চাতে তিনি বিদ্যমান, তাঁকে জানা না গেলেও তিনি সব জানেন। একমাত্র এই অন্তর্যামী আত্মাই জন্মমরণরহিত। এই আত্মা ভিন্ন আর যা কিছু আসে সে সকলেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩/৩/২৩)

সগুণ ব্রহ্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তি জানে যে তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুন। যে গাছতলায় থাকে সে জানে বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখনও কখনও কোন রঙই থাকে না। (কথামৃত—28-10-1882)

তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হলো, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল। সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কিনা। একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ড নিয়ে যাবার সময় দেখল যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না। দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই। আবার দণ্ড এধার থেকে ওধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝল, ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার।

(কথামৃত—22-10-1885)

যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তাঁকে ব্রহ্ম বলে' কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন তাঁকে

শক্তি বলে' কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে, দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। (কথামৃত. 19-10-1884)

যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায় না।
(কথামৃত—11-3-1883)

জ্ঞানী 'নেতি, নেতি' করে' বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাতে পোঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী— সেই ইট, চূণ সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। 'নেতি নেতি' করে' যাঁকে ব্রহ্ম বলে' বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে যিনি নিগুর্ন তিনিই সগুণ।····বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল. নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এ জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান; যিনি গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য জ্ঞান, তাঁর ঐশ্বর্য। (কথামৃত—5-8-1882)

সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠছে দেখা যায়।
(কথামৃত—1-1-1883)

উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বর মহেশ্বর, ঈশ, ঈশান প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কঠোপনিষদে ১/৩/১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে 'এই পুরুষ (ব্রহ্ম) সকল জীবের মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকলেও মায়ার দ্বারা আবৃত থাকায় আত্মরূপে প্রকাশ পান না; পরন্তু মানুষ নিজেকে দেহেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব বলে মনে করে।

উক্ত উপনিষদের ২/১/১ মন্ত্রে বলা হয়েছে, পরমাত্মার মায়ার দ্বারা আবৃত জীব তার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহ দিয়ে কেবল বাহিরে অবস্থিত রূপ রসাদি বিষয় দেখে থাকে। নিজের স্বরূপ জানতে বা বুঝতে পারে না। কোন কোন ধীর, ও বিচারশীল ব্যক্তি বহির্মুখ মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করে' নিজের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করেন।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ইনিই সকলের শাসক ইনি সব কিছু জানেন, ইনি জীবের অন্তর্যামী,' ইনি সকল জীব জগতের উৎপত্তির কারণ; স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর ভূত-সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ ইহার দ্বারা হয়ে থাকে। (৬)

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩/১) আছে—যাহা থেকে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়, যিনি থাকায় উৎপন্ন প্রাণী সকল

জীবিত থাকে, আবার মরণকালে যাঁর সঙ্গে অভেদ ভাব লাভ করে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩/৪ মন্ত্রে ঈশ্বরকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ মন্ত্রে বলা হয়েছে, যিনি দেবগণের উৎপত্তির এবং তাঁদের সামর্থ্যের কারণ, যিনি এই বিশ্বের পালক এবং সর্বজ্ঞ, যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন সেই রুদ্র আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

উল্লিখিত উপনিষদের ৩/১৭ ও ৩/১৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে—তাঁর কোন ইন্দ্রিয় না থাকলেও ইন্দ্রিয়সমূহের কাজ তাঁতে প্রকাশ পায়। তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, তিনি সকলের আশ্রয় এবং হিতকারী। (৩/১৭) তাঁর পা নাই, তবু তিনি চলেন; হাত নাই, তবু সব গ্রহণ করেন; তাঁর চক্ষু না থাকলেও দেখেন এবং কান না থাকলেও সব শোনেন। যা কিছু জানার যোগ্য বিষয় আছে সে সব তিনি জানেন, কিন্তু তাঁকে কেহ জানে না। তিনি সব কিছু উৎপত্তির এবং প্রকাশের কারণ; তিনি পরিপূর্ণ এবং মহান।

উপনিষদে এই সংসারকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়েছে। (কঠ ২/৩/১ দ্রষ্টব্য)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬/৬ মন্ত্রে বলা হয়েছে,—ঈশ্বর সংসারবৃক্ষের এবং এই সংসারে যে কাল গণনা করে, মানুষ কাজ করে, এই দুই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, এই সংসার এবং কাল,

ন্তই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তিনি আছেন বলে জগতের নানা পরিবর্তন ঘটছে। তিনি থাকায় মানুষ ধর্ম কর্ম করে। তিনি জীবের পাপ নাশ করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্যের তিনি মালিক। তাঁকে জানলে, তাঁর স্বরূপ অনুভব করতে পারলে মানুষ তাঁকে প্রাপ্ত হয়—যিনি জন্মরহিত এবং বিশ্বের আশ্রয়।

পরবর্তী সপ্তম মন্ত্রে যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁদের অনুভবের কথা বলা হয়েছে। তিনি মহেশ্বর; বৈবস্বত মনু প্রভৃতি জগতের যে সকল শাসক আছেন তাঁদেরও নিয়ামক। তিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও প্রভু। তিনি ত্রিভুবনের অধিপতি এবং সকল দেবমানবের বন্দনীয়।

তিনি চলেন, আবার তিনি চলেন না। তিনি দূরে আবার তিনি নিকটে আছেন। তিনি এই সমস্ত জগতের ভিতর বর্তমান, আবার তিনি সব কিছুর বাহিরে আছেন।

(ঈশোপনিষৎ—৫)

সেই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়। তাঁর দেহ নাই সুতরাং তাঁতে কোন ক্ষত হয় না। তাঁর শরীর নাই সুতরাং শিরাও নাই, স্নায়ু নাই তিনি নির্মল, পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সব কিছু দেখেন ও জীবের মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি কিছু থেকে উৎপন্ন হন না। (ঈশোপনিষৎ—৮ মন্ত্র)

———

মায়া

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা,—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ মা, এদেরই উপর ভালবাসা। (কথামৃত, 22-7-1883)

আমার জিনিষ. আমার জিনিষ বলে'—সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্ম সমাজের লোকগুলিকে ভালবাসা, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি; এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া,···· মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। (কথামৃত, 12-6-1884)

তাঁর কি ইচ্ছা, মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য—এই আছে, এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতে আমি কর্তা বোধ হয়; আর আমার এই সব স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, বাপ মা, বাড়ী ঘর—এই সব

আমার বোধ হয়। মায়াতে বিদ্যা আর অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যা মায়া সংসারে ভুলিয়ে দেয়; আর বিদ্যা মায়া—জ্ঞান ভক্তি, সাধুসঙ্গ ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। তাঁর কৃপায় যিনি মায়ার অতীত, তাঁর পক্ষে সব সমান— বিদ্যা অবিদ্যা সব সমান।

(কথামৃত, 3-12-1881)

কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বললে,—'আমি তোকে চিনেছি—তুই আমাদের হরে।' তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে।

(কথামৃত, 14-10-83)

যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতর আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে তবে জ্ঞান-সূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতর আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না। ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ালে রোদটা কাঁচের উপর পড়ে। তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়। কামিনী-কাঞ্চন-ঘর থেকে সরে দাঁড়ালে —সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা করলে তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিদ্যা অহংকার মেঘ যায়—জ্ঞান লাভ হয়। আবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ। (কথামৃত, 2-10-1884)

বেদান্ত বচন

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১/১০ মন্ত্রে 'বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ' এই পদটি আছে। বিশ্বমায়া বলতে সুখ দুঃখ এবং মোহরূপ সকল প্রকার সংসার-দুঃখ বোঝাচ্ছে। মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ,—অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে হরণ বা নাশ করেন বলে' পরমেশ্বরকে 'হর' বলা হয়। তাঁর স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না এবং তিনি জন্ম-মরণ-রহিত বলিয়া তিনিই পরব্রহ্ম। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় চৈতন্য এবং পরমানন্দ স্বরূপ। তিনি প্রকৃতিকে এবং জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জীবাত্মা তাঁকে ধ্যান করলে, তাঁর সঙ্গে নিজের অভেদ ভাব অনুভব করতে পারলে সুখ দুঃখ এবং মোহরূপ সকল সংসার-দুঃখ ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

উক্ত উপনিষদের ৪/৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম থেকে চারি বেদ, বেদবিহিত সকল প্রকার কর্ম এবং অতীত কালে যাহা কিছু ছিল, বর্তমান কালে আছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সে সবকিছু ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মের তো কোন প্রকার বিকার নাই? তবে তিনি কী প্রকারে নাম ও রূপাত্মক সব কিছুর উপাদান হতে পারেন? এই শঙ্কার সমাধানের জন্য উপনিষদ তাঁকে 'মায়ী' বলেছেন। ব্রহ্ম তাঁর অনির্বচনীয় মায়া শক্তির প্রভাবে সবকিছু প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর 'মায়া'

মায়াশক্তির প্রভাবে জীবসমূহ অন্ধের ন্যায় ইতস্তত পরিচালিত হয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করছে।

পরবর্তী ৪/১০ মন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রকৃতিকে মায়া বলে জানবে, আর যিনি মায়ী অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ামক তিনি হচ্ছেন মহেশ্বর, তিনি নামরূপাত্মক জগতের উপাদানরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। যা কিছু দেখা, শোনা বা চিন্তা করা যায় সে সব যেন তাঁর দেহের অবয়ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী কাঞ্চন বলতে মানুষের স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি ও অর্থলালসা বোঝাতেন। কাম ও লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বিবিধ চেষ্টা করে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে সুখও পায় না, তার দুঃখও দূর হয় না। কারণ সে মোহগ্রস্ত। কি করলে প্রকৃত সুখলাভ বা দুঃখ নিবৃত্তি হতে পারে সে ঠিক ঠিক বোঝে না, বুঝতেও চায় না। এই সুখ দুঃখ ও মোহের মূলে আছে তার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বা নিজে কী তাহা স্বীকার না করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী কাঞ্চনকে মায়া বলেছেন; আবার এই দুটিকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মায়া কী বস্তু তাহা বুঝতে পারলে, মায়া মানুষকে বিক্ষিপ্ত করার বা তার বুদ্ধিবৃত্তিকে আবৃত করার শক্তি হারায়। মানবজীবনে কোন উপায়ে যথার্থ সুখ লাভ হয়, বা দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে তাহা ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারলে সে

আর কাম, লোভ ও মোহের বশীভূত হয়ে ছুটাছুটি করে না। অতি গাঢ় কালো মেঘ কখনও সূর্যকে ঢাকতে পারে না, সেটা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে। কাম ও লোভরূপ কৃষ্ণ মেঘের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেই বিশ্ব মায়ার নিবৃত্তি ঘটে, মায়াবী তখন নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেন।

ঈশ্বর

বেদান্ত বচন

ঈশোপনিষদের পঞ্চম মন্ত্র; তিনি চলেন বলে মনে হ
কিন্তু তিনি চলেন না। (সর্বব্যাপী তিনি কোথ
যাবেন ?) তিনি দূরে; অজ্ঞান ব্যক্তিরা তাঁকে অনুভ
করতে পারে না। তিনি আবার নিকটে আছেন
জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ তাঁকে নিজেদের আত্মা বলে' অনুভ
করেন। তিনি আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী; তা
এই জগতের ভিতরে আছেন আবার তিনি সবকি
বাইরে রয়েছেন; কোন কিছু তাঁকে সীমাবদ্ধ কর
পারেন না।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী
৯, ১০, ১১ মন্ত্রে আছে,—ঈশ্বর এক এবং সূক্ষ্মরূপে সক
জ্ঞানীর আত্মারূপে আছেন। তিনি সর্বত্র সকল প্রাণ
অন্তরাত্মায় থেকে কী প্রকারে স্বরূপে বর্তমান থাকে
এই তিন মন্ত্রে তার তিনটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে
অগ্নিতত্ত্ব জগতের সর্বত্র অবস্থিত আছে; কিন্তু উহ
প্রকাশ দাহ্য বস্তুর আকার অনুসারে ভিন্ন দেখায় (নব
মন্ত্র)। সর্বব্যাপী বায়ু প্রাণবায়ুরূপে সকল জীবের অন্ত

থেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেলেও সকল সময় একরূপ অখণ্ড থাকে। (দশম মন্ত্র)

একটা আশংকা উঠতে পারে। ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে যখন আছেন তখন কী প্রাণীর সুখ দুঃখ তিনিই ভোগ করেন? এর উত্তর পরের মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলোকের সাহায্যে মানুষের চক্ষু প্রিয় অপ্রিয় নানারকম জিনিষ দেখে এবং দেখে খুশি বা অখুশি হয়। কিন্তু এই কারণে সূর্যে কোন গুণ বা দোষ স্পর্শ করে না। এই প্রকার ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরাত্মা হলেও তাদের সুখ দুঃখে তিনি লিপ্ত হন না।

কঠোপনিষদের ২/৩/৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে, পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন ও সূর্য কিরণ বিকীরণ দ্বারা উত্তাপ প্রদান করেন। তাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং যম নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত থাকে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬/১১ মন্ত্রে আছে,—এক জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর আছেন যিনি সকল প্রাণীর অন্তরে গোপনভাবে বর্তমান। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি জীবের অন্তরাত্মা, তিনি সকল প্রাণীর যথার্থ স্বরূপ। তিনিই তাদের কৃত নানা কর্মের নিয়ামক, তিনিই সকলের অন্তরে অবস্থিত, তিনি তাদের সব কাজ দেখেন, তিনি সকল প্রাণীকে চেতনা প্রদান করেন। অথচ, তাঁর কোন উপাধি নাই (তিনি ইহা বা এইরূপ, বলা যায় না)। প্রকৃতির স্বত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ তাঁকে স্পর্শ করে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩/১ মন্ত্রে আছে,—এ
অদ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তিসমূহের সহায়ে সকল স
সকল স্থানে অবস্থিত সকলকে শাসন করেন। স
স্থানের সব প্রাণীকে তাদের উৎপত্তির এবং উন্নতির স
ছোট বড় সকলকে নিজের শক্তি সমূহের দ্বারা নিয়ন্
করেন। যাঁরা এই তত্ত্ব জানেন,—ঈশ্বরই একমাত্র ক
বলে' অনুভব করেন। তাঁরা বারবার জন্ম মরণ
থেকে ত্রাণ পেয়ে থাকেন।

আলোচ্য উপনিষদের পরবর্তী ৩/২ মন্ত্রে বলা হয়ে
এই ঈশ্বরকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়। সকল কা
তিনি একাই আছেন; কখনও দ্বিতীয় কিছু ছিল না এ
নাই। মায়াশক্তি তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। তিনি সৃষ্টিকা
জগৎকে প্রকাশ করে সব প্রাণীকে পালন করেন; আ
প্রলয়কালে সে সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে
তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ।

উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তদশ মন্ত্রে
হয়েছে,—ঈশ্বর স্বয়ং এই বিশ্বের আত্মা, তাঁর জন্ম
হয় না, তিনি সকল সময় সকলের প্রভুরূপে বর্তম
তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র গমন করেন এবং বিশ্বকে পা
করেন। তিনি সকল সময় এই জগৎকে শাসন কর
তিনি ছাড়া জগতের অন্য কোন শাসক নাই।

পরবর্তী ৬/১৮ মন্ত্রে মুক্তিকাম ঋষি এইভাবে প্রা
করছেন,—'যে পরমেশ্বর সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মাকে উৎপা

করেছিলেন এবং ব্রহ্মার প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে বেদ সকল প্রকাশ করেছিলেন সেই জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর আমার বুদ্ধির বিকাশ করুন। আমি মুক্তি ব্যতীত আর সকল কামনা ত্যাগ করে' তাঁর শরণ গ্রহণ করছি।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে বলেছেন,—"এই অক্ষর পরমেশ্বরের শাসনাধীনে সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থেকে নিজের নিজের কাজ করে' চলেছেন; এই অক্ষরের নিয়ন্ত্রণে স্বর্গলোক ও পৃথিবী নিজ নিজ স্থানে বর্তমান আছে।" ইত্যাদি।

———

ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে,—যা থেকে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়, উৎপত্তির পর যাঁর আশ্রয়ে বেঁচে থাকে ও বৃদ্ধি পায়, বিনাশকালে যাঁতে বিলীন হয়, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা।

কঠোপনিষদের ৩/৩/১ মন্ত্রে সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সংসার বৃক্ষের মূল উপরের দিকে এবং শাখা সকল নিচের দিকে। অর্থাৎ এই সংসার ব্রহ্ম থেকে নির্গত বা প্রকাশিত হয়েছে। এই মূলের বিনাশ হয় না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁকে আশ্রয় করে' আছে। এই সংসার যখন বিনষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মে মিলিত হয়।

পরবর্তী ৩/৩/২ মন্ত্রে আছে, জগতে যাহা কিছু আছে, সে সকল ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত। তিনি কঠোর শাসক; কেহই তাঁর শাসনকে এড়াতে পারে না। যাঁরা এই স্রষ্টা ও পালনকারী ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তাঁরা জন্ম-মরণের ভয় অতিক্রম করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ২/১৬ মন্ত্রে আছে,—এক সর্ব-ব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা আছেন। তিনি সৃষ্টির

প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। তিনিই বিরাটরূপে বর্তমান থাকেন। তিনিই বিভিন্ন জীবের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সকল জীবের অন্তর্যামী এবং সর্বব্যাপী।

পরবর্তী ২/১৭ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—যে জ্যোতির্ময় পরমাত্মা অগ্নিতে ও জলে বর্তমান, যিনি ধান গম প্রভৃতি উদ্‌ভিদে এবং বৃহৎ বৃক্ষ সমূহে অবস্থিত, যিনি সব প্রাণীর আত্মারূপে বিশ্বের সর্বত্র বর্তমান আছেন, সেই পরমাত্মাকে বার বার নমস্কার করি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩/২ মন্ত্রের অর্থ ঃ—একই রুদ্র চিরকাল ছিলেন ও আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। তিনি তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা ত্রিভুবনের সকল ব্যাপার নিয়মিত করেন। সকল প্রাণীর অন্তরাত্মারূপে তিনি বর্তমান আছেন, তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং পালন করছেন। আবার, প্রলয়কালে সব কিছু নিজের মধ্যে লীন করবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩/১৪/১ বলা হয়েছে ঃ—নাম ও রূপযুক্ত সকল পদার্থ—যাহা কিছু দেখা, শোনা, অনুভব অথবা অনুমান করা যায় সে সকল ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়; কেননা, সে সকল ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়, প্রলয় কালে তাঁতে লীন হয়, আর স্থিতির সময় তাঁকে অবলম্বন করে' জীবিত থাকে। অতএব, সংযতভাবে, কোন

কিছুতে আসক্ত না হয়ে, অথবা কিছুকে ঘৃণ্য এবং ত্যাজ্য মনে করবে না। সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করে তাঁর উপাসনা করবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি হয় বলা হয়েছে। ঋষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বটবৃক্ষের একটা ফলকে ভাঙতে বলে' জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফলের ভিতর কি দেখছ? শ্বেতকেতু বললেন, 'অত্যন্ত ছোট ছোট বীজ আছে। 'একটা বীজ ভেঙে দেখ, ভিতরে কী আছে? 'বীজের ভিতর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।' এই রকম অল্প পরিমাণ বীজ থেকে ঐ বিশাল বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। শ্রদ্ধাবান্ হও বৎস। এই যে নামরূপাত্মক বিশাল জগৎ ইহার উৎপত্তির মূলে ব্রহ্ম আছেন সূক্ষ্ম কারণ রূপে। তাঁকে দেখানো গেলেও সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, ইহাই সত্য। তুমিও সেই ব্রহ্ম।"

এখানে ব্রহ্মকে জগৎ-উৎপত্তির কারণ, বলা হ'ল।

ঈশ্বর বিধাতা

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে ঋষিগণ প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার নিকট শুভ বুদ্ধি প্রার্থনা করে বলছেন;—"যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর কোন বর্ণ বা জাতি নাই, যাঁর কোন প্রয়োজন না থাকলেও নিজের শক্তি দ্বারা নানা জাতি ও বর্ণের সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে সে সকল যাঁহাতে লীন হয়, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন; এই বুদ্ধি সহায়ে আমরা যেন সর্বদা আত্মচিন্তায় রত থাকতে পারি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪/৪ মন্ত্রে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমিই নীলবর্ণ ভ্রমর এবং সবুজ রঙের শরীর এবং লাল রঙের ঠোঁট যুক্ত শুক প্রভৃতি পাখী হয়েছো, তুমি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেঘ, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু এবং সাগর সকল তুমিই হয়েছ। এ সকল উৎপত্তির মূলে তুমি আছ। তোমার অন্ত নাই তুমি সর্বব্যাপী হয়েছ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সব বৈচিত্র্যের তুমিই বিধাতা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পরমাত্মাকে 'সেতু' বলা হয়েছে। কোন নদীর উপর নির্মিত সেতু কিংবা বাঁধ যেমন উভয় কূলের মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সমূহের মধ্যে ব্যবধান দূর করে ও তাদের পরস্পর মিলনের সহায়ক হয়, ঈশ্বরও সেই রূপ স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি লোককে ধরে রেখেছেন।

ঈশ্বর

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

অহংকার হয় অজ্ঞানে। বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বরই কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো জীবন্মুক্ত। "আমি কর্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ অশান্তি।

(কথামৃত—29-10-1882)

যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ 'নেতি নেতি করে' সব ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বর মায়া-জীব-জগৎ, জীব-জগৎ শুদ্ধ তিনি।

(কথামৃত—28-11-1883)

তাঁর জন্যই সাধন ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে। নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে; পশুভাব চলে যাবে,

দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে, তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।

(কথামৃত—28-10-1882)

ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না; আবার ছোট ভাবটাও পারে না। (ঈশ্বর) এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

(কথামৃত—11-3-85)

ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না।

(কথামৃত—17-10-1885)

ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু।

(কথামৃত—17-10-1882)

যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না। ......তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহ ধারণ করে' আসেন, এও সত্য; নানা রূপ

ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদ তাঁকে সাকার নিরাকার, দুই বলেছে। সগুণ বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

(কথামৃত—11-3-1883)

ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন,—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না।

(কথামৃত—8-4-1883)

সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিষ করেছেন। ছোট বড়, বলবান দুর্বল, ভাল মন্দ। ভাল লোক মন্দ লোক এসব তাঁর লীলা। ......যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয়, আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হতো। পাপকে ভয় হতো না। পাপের শাস্তি হতো না। ......যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁর ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর তুমি ঘরনী; আমি রথ তুমি রথী; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন বলাও তেমনি বলি।

(কথামৃত—15-4-1883)

তিনি এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে।

(কথামৃত—5-4-1884)

ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়। তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না।

(কথামৃত—24-8-1882)

ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না? কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে'।

(কথামৃত—24-1-82)

ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রং নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ তাঁর শক্তিরই গুণ। .....ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কি মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি, নেতি বিচার করে যা বাকি থাকে, আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

(কথামৃত—20-8-1883)

হাজার লেখাপড়া কর, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। শুধু পণ্ডিত বিবেক বৈরাগ্য নাই—কামিনী কাঞ্চনে নজর আছে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই-ই বিদ্যা, আর সব মিছে।

(কথামৃত—27-12-1883)

তিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। ......ভগবানকে দর্শন করলে তবে তো শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবে আনন্দ লাভ হবে, শক্তি বাড়বে।

(কথামৃত—27-12-1883)

হরিই সেব্য, হরিই সেবক—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে', হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে' বোধ হয়। তার পর সেই দেখে যে হরিই এই সব হয়েছেন—ঈশ্বরই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। ......তাই জীব জগৎ জেনে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পোঁছাতে হয়। তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে দেখে যে তিনিই এই সব জীব জগৎ হয়েছেন।

(কথামৃত—2-3-1884)

তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সংকোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল কল্লোল —নিচে গভীর জল।......

(কথামৃত—14-12-1884)

সত্ত্ব গুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ ও তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্ব গুণকে সাদা রং এর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন, রজোগুণকে লাল রং এর সঙ্গে,

আর তমোগুণকে কাল রং এর সঙ্গে।

(কথামৃত—9-5-188

ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বা
ঘরদ্বার, ছেলে পিলে, এসব বাজীকরের ভেলকি
বাজীকর বাজনা বাজাচ্ছে আর সব বলছে, লাগ্ লা
লাগ্। ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলি আকাশে উ
গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য। এ
আছে, এই নাই।

(কথামৃত—13-6-188

ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যা
ততই শীতল। স্নান করলে আরও শান্তি। তবে জী
জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এসব, তিনি আছেন বলে' আছে
তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। '১' এর পি
অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। '১' কে মু
ফেললে শূন্যের কোন পদার্থ থাকে না।

(কথামৃত—1-1-188

তাঁর বিষয় বিচার করে কে বুঝবে? তাঁর পাদপ
যাতে ভক্তি হয়, তাই সকলের করা উচিত। তাঁর অন
ঐশ্বর্য—কি বুঝবে? তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে
......(তাঁকে) এ চক্ষে দেখা যায় না, তিনি দিব্য চ
দেন, তবে দেখা যায়।

(কথামৃত—23-2-188

তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্কার দরকার। কিছু করা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক, আর পূর্বজন্মেই হোক। কথামৃত—19-9-1884)

ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।—ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বললেন, 'আমি তৃপ্ত হয়েছি', তখন জগৎ শুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল। (কথামৃত—19-9-1884)

অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম জ্ঞান—এক ঈশ্বর সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ ক'রে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

আবার আছে—তিনি এক দুয়ের পার-বাক্য-মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা—এর নাম পাকা ভক্তি। (কথামৃত—5-10-1884)

চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়? ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড্ হয়? তিনি যে বোধস্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ। (কথামৃত—13-7-1885)

শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়। তাঁকে ঘরে আনতে হয়,—আলাপ করতে হয়। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। রাজাকে

কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দুই একজন বাড়ীতে
আনতে আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে।

(কথামৃত — 14-7-8

তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে অবিদ্যাও আছে।
অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলো
আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারা
জিনিষ বটে; তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লো
তয়ের করবেন বলে' ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়।
জিতেন্দ্রিয় কিনা করতে পারে? ঈশ্বর লাভ পর্যন্ত তাঁ
কৃপায় করতে পারে। আর অন্য দিকে দেখ,—কা
থেকে তাঁর সৃষ্টি লীলা চলছে। (কথামৃত—2-4-1882

গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না
স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সবই ঈশ্বরাধীন।

(কথামৃত, December, 188

তাঁর নামগুণ কীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালি
যায়। দেহবৃক্ষে পাপ পাখী; তাঁর নাম যেন হাততা
দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের স
পাখী পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নাম গুণ কীর্ত
চলে যায়। আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যে
তাপে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর না
গুণ কীর্তনে পাপ পুষ্করিণীর জল আপনা আপনি শুকি
যায়। (কথামৃত — 18-2-188

তিনি চৈতন্যরূপে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।....
তিনিই চৈতন্য স্বরূপ। (কথামৃত, 26-9-1883)

তাঁকে ধ্যান করতে হলে প্রথমে উপাধিশূন্য তাঁকে ধ্যান করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্য মনের অতীত।
(কথামৃত, 26-12-1883)

শব্দ ব্রহ্ম, ঋষি মুনিরা ঐ শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন। সিদ্ধ হলে শুনতে পায়। নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠছে—অনাহত শব্দ বলেছে। এক মতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূর থেকে শব্দ কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ কল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পোঁছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধরে ধরে গেলে, তার প্রতিপাদ্য বৃহ্ম, তাঁর কাছে পোঁছান যায়। তাকেই পরমপদ বলেছে। ('যত্র নাদো বিলীয়তে।' 'তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদম্'।) 'আমি' থাকতে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই, তুমিও নাই, একও নাই, অনেকও নাই, সেইখানেই এই দর্শন। (কথামৃত, 9-3-1884)

মনে কর, সূর্য আর দশটা জলপূর্ণ ঘট রয়েছে। প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে, একটা সূর্য আর দশটা প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায় তা হলে বাকি থাকে একটা সূর্য ও একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। এক একটা ঘট যেন এক একটা

জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে যেন সত্য সূর্যের কা
যাওয়া যায়, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পৌঁছান যায়
জীব যদি সাধন ভজন করে তাহলে পরমাত্মা দর্শন কর
পারে। শেষের ঘটটি ভেঙ্গে দিলে কি আছে মুখে ব
যায় না।

জীব প্রথমে অজ্ঞান থাকে। ঈশ্বর-বোধ নাই, না
জিনিষ বোধ—অনেক জিনিষ বোধ। যখন জ্ঞান হ
তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।

(কথামৃত, 9-3-188

ঈশ্বরকে দেখা যায়। তপস্যা করলে তাঁর কৃপা
ঈশ্বর দর্শন হয়। (কথামৃত, 24-5-1882)

যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় না। ব্রহ্ম
জ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে তবে অহং নিজের ব
আসে। তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। (প্রশ্ন,—
ঈশ্বর দর্শন কিরূপ?) থিয়েটারে অভিনয় দেখ নাই
লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে এমন সময় পর্দা উ
গেল। তখন সকলের মনটা অভিনয়ে যায়। আর বা
দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া। আবা
পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা প
গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

(কথামৃত,—24-5-1885

ঈশ্বরই সব হয়েছেন—মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিংশ
তত্ত্ব। 'সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি

তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ায়ও গুরু রূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন—তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

(কথামৃত,—24-5-1884)

তিনিই নিমিত্ত কারণ, তিনিই উপাদান কারণ। তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। যেমন মাকড়সা, নিজে জাল তৈয়ার করলে, আবার সেই জাল নিজের ভিতর থেকে বার করলে। (কথামৃত,—৫ম ভাগ)

জীব

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

জীব চার প্রকার। বদ্ধ জীব, মুমুক্ষ জীব, মুক্ত জীব ও নিত্য জীব।

নিত্য জীব যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

বদ্ধ জীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

মুমুক্ষ জীব-যারা মুক্ত হতে চেষ্টা করে—কেউ পারে, কেউ বা পারে না।

মুক্ত জীব যারা সংসারে, কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়। যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে। (কথামৃত,—5-3-1882)

জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে আর তার আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

(কথামৃত,—18-12-1882)

জীব যেমন কর্ম করে তেমন ফল পায়। ······ 'আমি আর আমার' অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি আমি করছ, তিনি আত্মা বৈ আর কেউ নয়। বিচার কর—তুমি শরীর না মাংস, না আর কিছু? দেখবে তুমি কিছু নয়। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার আমি কিছু করি না। আমার দোষও নাই গুণও নাই। পাপ ও নাই, পুণ্যও নাই।

(কথামৃত,—8-4-1883)

জীবের আলাদা কথা। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা, সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইসকুরুপ দিয়ে আঁটা। অষ্ট পাশ। লজ্জা ঘৃণা ভয় জাতি কুল শীল শোক জুগুপ্সা, এই অষ্ট পাশ। (কথামৃত,—10-6-1883)

লিঙ্গ-শরীর বা জীবাত্মা। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারিটি জড়িয়ে লিঙ্গ-শরীর। ······(জীবাত্মা) অষ্ট পাশ জড়িত আত্মা। (কথামৃত—2-10-1884)

জীবের কর্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর যাতে তাঁকে লাভ হয়, সে জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। (কথামৃত—6-12-1884)

জীব যখন বলে, 'হে ঈশ্বর আমি কর্তা নই তুমিই কর্তা—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না। (কথামৃত—15-6-1884)

বেদান্ত বচন

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—সৃষ্টির আদিতে এক সৎস্বরূপ পরমাত্মা ছিলেন। অতীত সৃষ্টির কথা তাঁর মনে ওঠায় তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি একা আছি; অনেক হবো, নিজেকে নানারূপে প্রকাশ করব। এইরূপ ভেবে তিনি তেজঃ (অগ্নি) জল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পরে তিনি এই তিনটি সূক্ষ্ম মহাভূতকে মিলিয়ে (জগৎ সৃষ্টির উপাদান) স্থূল মহাভূতে পরিণত করলেন। প্রতিটি সূক্ষ্ম মহাভূতের অর্ধভাগের সহিত অপর দুই সূক্ষ্ম মহাভূতের সিকি ভাগ মেলালেন। তারপর চিন্তা করলেন; আমি নিজের স্বরূপ অপরিবর্তিত রেখে, সূর্য যেরূপভাবে জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সেইভাবে এই স্থূল মহাভূতের মধ্যে প্রবেশ করে' নানা রূপযুক্ত জীবজগৎ রূপে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করব। (মূলের 'অনেন জীবেন আত্মনা' এই বাক্যাংশে এই কথাই বলা হয়েছে।) পরে বলা হয়েছে, সৎস্বরূপ পরমাত্মা ঐ ভাবে নিজেকে নামরূপ যুক্ত বিবিধ বস্তু ও প্রাণীকে প্রকাশ করলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে বলা হয়েছে, জীবাত্মার বিনাশ হয় না। অরুণ ঋষি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে একটা বৃহৎ বৃক্ষকে দেখিয়ে বললেন; ঐ গাছটির সমস্ত অংশ জীবাত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত

হয়ে থাকায় গাছটি শিকড় দিয়ে জল ও মাটির রস পান করছে এবং আনন্দে বেঁচে আছে।

পরে পিতা বললেন, জীব বৃক্ষটির যে শাখা ত্যাগ করে, সেই শাখাটি শুকিয়ে যায়। জীব সমস্ত গাছটিকে ছেড়ে গেলে গাছটা মরে যায়।

শেষে পিতা বললেন, 'জীব দেহ ছেড়ে গেলে দেহ মরে যায়, জীব মরে না। এই জীব অতি সূক্ষ্ম এবং সৎস্বরূপ। এই সৎস্বরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি ব্যতীত পৃথক কোন জীবাত্মা নাই। তুমিই সেই সৎস্বরূপ আত্মা। 'তত্ত্বমসি'।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর পঞ্চম মন্ত্রে জীবকে কর্মফলভোক্তা বলা হয়েছে। এই জীব প্রতি দেহে প্রাণ প্রভৃতির ধারক আত্মা থেকে ভিন্ন হয়। আর এই আত্মাই সর্বব্যাপী এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে যা কিছু ঘটেছে, হচ্ছে এবং হবে সে সকল ব্যাপারের নিয়ামক। যিনি এই নিজেকে এই আত্মার সহিত একত্ব অনুভব করেন, তিনি আর নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন না। এক আত্মা দ্বিতীয় কিছুর অস্তিত্ব না থাকায় তাঁর আর ভয় থাকে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম মন্ত্রে জীবের স্বরূপ বলা হয়েছে। একটা কেশের অগ্রভাগকে

একশত ভাগে বিভক্ত করার পর, সেই এক এক ভাগকে আবার যদি শতভাগে ভাগ করা যায় তাহলে তার আকার যে রকম সূক্ষ্ম হতে পারে জীবও সেইরূপ অণু পরিমাণ। লিঙ্গদেহ অতি ক্ষুদ্র এবং আত্মা সেই লিঙ্গ-দেহে প্রকাশ পান বলে জীবাত্মাকে অণু পরিমাণ বলা হয়েছে। যথার্থতঃ জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন এবং অনন্ত অর্থাৎ সর্বব্যাপী।

মন

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক। ....মন নিজের কাছে হলে তবে সাধন ভজন হবে। ....মন একলা থাকলেই ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়।

(কথামৃত—1-1-1882)

এই মনে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

(কথামৃত—26-2-1882)

মন যেন মাটি মাখানো লোহার সূচ ঈশ্বর চুম্বক পাথর। মাটি না ধুয়ে গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে সূচের মাটি ধুয়ে যায়। সূচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি মাটি ধুয়ে গেলেই সূচকে চুম্বকে টেনে লবে অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়।

(কথামৃত—2-4-1882)

মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন।

(কথামৃত—17-10-1882)

মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপা-ঘরের কাপড়। লালে ছাপাও লাল, নীলে ছাপাও নীল। .....মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ তো সেইরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ তো ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা এই সব হবে।

(কথামৃত—27-10-1882)

মন আসক্তি শূন্য হলেই তাঁর দর্শন হয়। শুদ্ধমনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না, তিনি বৈ আর কেউ শুদ্ধ নাই।

(কথামৃত—1-1-1883)

ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। ......মনে আসক্তি মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর পরণে গেরুয়া ? বড় ভয়ঙ্কর।

(কথামৃত—29-3-1883)

মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়।

(কথামৃত—15-6-1883)

লোকে সাধন ভজন করে, কিন্তু মন কামিনী-কাঞ্চনে মন ভোগের দিকে; তাই সাধন ভজন ঠিক হয় না।

(কথামৃত—9-3-1884)

মন মত্ত করী। হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁদ করিয়ে দিতে পার, আর ধুলা কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাহলে শুদ্ধ মন হয়। সে মন আবার কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হবার অবসর পায় না।

(কথামৃত—19-10-1884)

মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। ....মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ তিনিই মুক্ত হতে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ।

(কথামৃত—26-10-1884)

ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই অহং নাশ—যেটা 'আমি, আমি' করছে। এটি ভক্তি পথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচার পথেও হয়।

(কথামৃত—9-5-1885)

যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না।

আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই ।

(কথামৃত—14-7-1885)

মনে ত্যাগ হলেই হলো; তা হলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো ?

(কথামৃত—5-1-1886)

ন্যাংটা (তোতাপুরী) বলতো, মনেই জগৎ, আবার মনেই লয় হয়।

(কথামৃত—17-4-1886)

বেদান্ত বচন

কেন উপনিষদে (১/৬) বলা হয়েছে, মনের সামর্থ্য নাই কোন বিষয়ে সংকল্প করার, বুদ্ধি নিজের ক্ষমতা কোন বিষয় স্থির করতে পারে না। চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন বলেই মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ কাজ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং যাঁর চৈতন্যে মন বুদ্ধিকে চেতন বলে' মনে হয়, সেই জানা মন-বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হয় না।

কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে মনের কাজ সম্বন্ধে নানা কথা আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয় সকলকে রথের ঘোড়া এবং মনকে ঘোড়ার মুখে লাগানো লাগাম বলা হয়েছে। জীবাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় সকল এবং মন দিয়ে রূপ রস প্রভৃতি বিষয় ভোগ করে। কিন্তু, যে ব্যক্তির মন তার

বশে চলে না, যার বুদ্ধি ভাল মন্দ বিচার করতে অক্ষম, তার ইন্দ্রিয়সমূহ নানা মন্দ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় (১/৩/৫)। যে ব্যক্তি ভালমন্দ বিচার সমর্থ, যাঁর মন তাঁর বশে চলে, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সৎ কাজে লাগাতে পারেন। (১/৩/৬) যার বিচার বুদ্ধির অভাব, মন যার বশীভূত নয়, যে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় ভোগ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না, সে কখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলে বারবার জন্মমরণের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। (১/৩/৭)। কিন্তু যার বিবেক আছে, যে মনকে নিজের বশে রাখতে পাবে, সে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ অনুভবের ফলে চিরশান্তি লাভ করে। (১/৩/৮-৯)

কঠ উপনিষদে ২/১/১১ মন্ত্রে বলা হয়েছে—মনের দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হবে, অনুভব করতে হবে যে ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই। পরে ২/৩/৯-১০ মন্ত্রে প্রকাশিত হয়; পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ মন যখন বিষয় গ্রহণে বিরত হয় এবং বুদ্ধি যখন স্থির হয়, সেই অবস্থায় আত্মার স্বরূপ অনুভব করে' ধন্য হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/৩/৪) মনের নানা ভাবে প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। লোকে বলে, 'আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই আমি দেখি নাই। আমি আনমনা ছিলাম, তাই শুনতে পাই নাই।' সুতরাং

বোঝা যায়, কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন থাকলে তবে সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়। সেখানে আরও বলা হয়েছে, কাম (স্ত্রী সঙ্গে বাসনা), সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা (কিছু দেখা না গেলেও আছে বলে' বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা, ধৈর্য, অধৈর্য, লজ্জা, ধী (বিচার জ্ঞান), ভয়—এ সকলেই মনের বিভিন্ন প্রকাশ। এখানে মনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও ধরা হয়েছে।

———

ধ্যান

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?

(কথামৃত—17-10-1883)

ধ্যান করবে মনে, কোনে ও বনে।

(কথামৃত—26-2-1883)

প্রত্যূষে ও শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল, ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর।

(কথামৃত—June, 1883)

আর এক আছে—ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা—মন বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সূর্য ধ্যান করলে সত্য সূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

(কথামৃত, 16-12-1883)

হৃদয় ডঙ্কা পেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে। এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে।

তবে তোমার যেখানে অভিরুচি, ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময়, কোথায় তিনি নাই ?

(কথামৃত—9-3-1884)

আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম, এমন করলে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন করলে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই ? চক্ষু খুলে দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা চন্দ্রসূর্য—মধ্যে জলে স্থলে সর্বভূতে তিনি আছেন।

চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে তবুও ধ্যান হয় ....দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হ'লে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

(কথামৃত—11-10-1884)

সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না, তার আরোপ করতাম। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার জন্য তাগ্ করছে, কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত বাজনা, গাড়ী ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে' কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই, সে জানতে পারলে না কাছ দিয়ে বর চলে গেল। ....ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শ

বোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না। সাপটাও জানতে পারে না। গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না, যেন বার বাড়ীতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বাইরে পড়ে থাকে।

ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না, বাইরে পড়ে থাকে।

(কথামৃত—12-4-1885)

বেদান্ত বচন

ছান্দোগ্য উপনিষদের তিন অধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকায়

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনার বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। আখ্যায়িকাটি এইরূপ। —বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের পর সনৎ কুমারের নিকট জিজ্ঞাসু (নারদ) গেলেন এবং বললেন, "ভগবন্! আমি অনেক পড়েছি, কিন্তু আত্মার স্বরূপ অনুভব করতে পারিনি। তাই আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।" নারদ কি কি পড়েছেন জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন যে তিনি চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, জ্যোতিষ, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয় অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর কথা শুনে বললেন, 'তুমি কেবল কতকগুলি নামই জান। সে

সকলের তাৎপর্য অবগত হওনি।' এরপর সনৎকু
তাঁকে নাম থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে' সুখস্ব
ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় সে সকল বিষয়ে উপ
দিলেন। আলোচ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ
ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করতে বলা হয়েছে।
হচ্ছে চিত্তের একাগ্রতা; ধ্যান যে মন্ত্র বা যে দেব
বিষয়ে করা হবে মনে সেই বিষয় ছাড়া অপর
চিন্তা না উঠলে তবে ঠিক ধ্যান হবে। ধ্যানে দে
ইন্দ্রিয়সকল কি রকম নিশ্চল তার কয়েকটা দৃষ্টান
পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, আকাশ যেন ধ্যান কর
ইত্যাদি। সনৎকুমার আরও বললেন, এ জগতে য
মনুষ্যোচিত মহত্ত্ব লাভ করতে ইচ্ছা করেন তাঁরা
ধ্যানের অভ্যাস করেন। যাদের বুদ্ধি বিবেচনা
তারা ঝগড়াটে হয় এবং পরের দোষ দেখে ও নিন্দুক হ

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রায়
বলা হয়েছে, যাহা ব্রহ্ম তাহাই আত্মা। যাহা কিছু দে
শোনা, বলা, অনুভব করা যায় সে সকলই আত্মা থে
প্রকাশিত হয়। ধ্যানও আত্মা থেকে প্রকাশিত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশ
ধ্যানকে আত্মদর্শনের সাধন বলা হয়েছে। যজ্ঞের
প্রয়োজনীয় অগ্নির উৎপাদন করতে দুটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ
হয়। নীচের কাঠটির নাম অধর-অরণি, উপরের কা

বলা হয় উত্তর-অরণি। আলোচ্য মন্ত্রে বলা হয়েছে, নিজের শরীরকে অধরারণি এবং ব্রহ্মের প্রতীক ওঁকার মন্ত্রকে উত্তরারণি ভাবিবে। ধৈর্যের সহিত দীর্ঘকাল প্রণব মন্ত্র ধ্যানের ফলে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হবে, কাঠের মাঝে আগুন যেমন লুকিয়ে থাকে ধৈর্যের সহিত ঘর্ষণের ফলে জ্বলে ওঠে, আত্মাও সেইভাবে দেহের মাঝে আছেন। ধ্যানের ফলে জ্যোতি স্বরূপ আত্মাকে অনুভব করা যায়।

মুণ্ডক উপনিষদের ২/২/৩-৪ মন্ত্র দুটিতে ধ্যান শব্দ ব্যবহার করা না হলেও ওঁকার অবলম্বনে ব্রহ্ম চিন্তনের এবং ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব অনুভবের বিধান দেওয়া হয়েছে।

অভ্যাসযোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ অসৎ বিচারের না বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি এটি একেবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়; তারপ তাঁর ইচ্ছায় বাহিরের ত্যাগ করতে হয়। অভ্যাস যোগে দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে। তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে কাম ক্রোধাদি বশ করতে কষ্ট হয় না।

(কথামৃত—1-1-1883)

ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নাম কীর্তন অভ্যাস করতে হয়। ....উপায় তাঁর নাম জপ, নাম কীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে।

(কথামৃত—16-10-1883)

অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে। মন ধোপা ঘরের

কাপড় তাকে লাগে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সে রঙ হয়ে যাবে।

(কথামৃত—19-9-1884)

বেদান্ত বচন

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১/১৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে—উৎসাহ ও ধৈর্যের সহিত ধ্যানের অভ্যাস করলে এই শরীরে ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। কিরূপে ধ্যানাভ্যাস করতে হবে, তার একটা উপমা দেওয়া হয়েছে। অরণি কাঠের ভিতর আগুন থাকে। সেই আগুন পেতে হলে দুটি কাঠ জোরে ঘষতে হয়। সেই ভাবে এই শরীর অবলম্বন করে' ধৈর্যের সহিত ওঁকার মন্ত্র ধ্যানের অভ্যাস করলে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

কৈবল্য উপনিষদের একাদশ শ্লোকে প্রায় উক্তরূপ নির্দেশ আছে। সেখানে জীবাত্মাকে নীচের অরণি এবং প্রণব মন্ত্রকে উপরের অরণিরূপে গ্রহণ করে' কেহ যদি জ্ঞানবিচারের অভ্যাস করে তাহলে সেই পণ্ডিত ব্যক্তি সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়।

সন্ন্যাস উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আত্মার স্বরূপ চিন্তা ত্যাগ করে' অন্য শাস্ত্রের অভ্যাস করা সন্ন্যাসীর পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র।

মুক্তিকা উপনিষদের ২/৮ শ্লোকে আছে—দীর্ঘকাল যত্নের সহিত অভ্যাসের ফলে, মনে কোনও বাসনা ওঠার

সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে অভ্যাস সফল হয়েছে।

মুক্তিকা উপনিষদের ২/৪০ শ্লোকে আছে, 'আমি শুদ্ধ আত্মা', এই একতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে অভ্যাসের ফলে যতকাল না সম্পূর্ণভাবে নিজের বশে আসে ততকাল মনে নানা কামনার উদয় হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে।

উক্ত মুক্তিকা উপনিষদে ২/৫৩ শ্লোকে আছে—যখন অহংকার থাকবে না এবং 'আমি শুদ্ধ ব্রহ্ম' এই প্রজ্ঞার অনুভব সকল সময় হতে থাকবে সেই অবস্থার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ধ্যানে অভ্যাস দৃঢ় হলে সাধকের এই অবস্থা লাভ হয়।

বাসনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

যতক্ষণ....বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে, আর কর্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি । বাসনা ত্যাগ কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

(কথামৃত—23-11-1883)

কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না, জিজ্ঞাসা করছো? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। ও দেশে মাঠে জল আনে। মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেড়িয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ (গর্ত)। প্রাণপনে তো জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে । বাসনা ঘোগ। জপ তপ করছে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে । ....বাসনা না থাকলে সহজে উর্ধ্ব দৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।

(কথামৃত—11-10-1884)

বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ।

(কথামৃত—13-7-85)

বেদান্ত বচন

মুক্তিকা উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বহু শ্লোকে বাসনা শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। ঐ শ্লোকগুলির কয়েকটির ভাবার্থ পরপর লেখা যাচ্ছে।

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁকে লোক বাসনা, শাস্ত্র বাসনা, এবং দেহ বাসনা ত্যাগ করতে হবে। মরণের পর স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করার বাসনার নাম লোকবাসনা। শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে' অপরের প্রশংসা এবং সম্মান লাভের বাসনাকে বলা হয় শাস্ত্র বাসনা। নানা উপায়ে শারীরিক সুখলাভের বাসনা হচ্ছে দেহ বাসনা। এই তিনটি বাসনার কোন একটাও থাকলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না ॥২॥

বাসনাকে শুভ ও অশুভ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অশুদ্ধ বাসনাকে শুদ্ধ বাসনার স্রোতে প্রবাহিত করতে পারলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ॥ (৩-৪) ॥

বাসনারূপিণী নদীর স্রোত পাশাপাশি দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। পুরুষকার ও প্রযত্নের সহিত শরীর মনের শক্তি প্রয়োগ করে' অশুভ বাসনার স্রোতকে শুভ বাসনার স্রোতে মেলাতে হবে ॥ (৫-৬) ॥ বাসনা নাশের জন্য যত্নের সহিত দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে যখন কোনও বাসনা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে অভ্যাস সফল হয়েছে ॥ (৮) ॥

বাসনা ক্ষয়, বিজ্ঞান (আত্মস্বরূপ চিন্তন) এবং মনোনাশ—এই তিনটি সাধনা যদি একসঙ্গে দীর্ঘকাল অভ্যাস করা যায় তা হলে সুফল (আত্মজ্ঞান) পাওয়া যায় ।।(১০)।।

মানুষ বহু জন্ম ধরে' সংসার বাসনাকে (বিষয় ভোগ বাসনাকে) প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। উপরে কথিত তিনটি সাধনার একসঙ্গে দীর্ঘকালে অভ্যাস ব্যতীত সংসার বাসনা অন্য কিছুতেই নষ্ট হয় না।। (১৪)।। অতএব, বিবেকী ব্যক্তি পৌরুষ এবং প্রযত্নের সহিত বিষয়ভোগ বাসনাকে দূরে সরিয়ে উক্ত তিনটি সাধনার অভ্যাসে রত থাকবেন ।। (১৫)।। যতকাল মনে বিষয়-বাসনার উদয় হতে থাকবে ততকাল মানুষ বদ্ধ থাকে; বাসনা ত্যাগ করতে পারলেই মুক্তি লাভ হয়। যিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছা করেন, তিনি সকল সময় মনকে বিষয় চিন্তা শূন্য করবেন ।। (১৬)।। চিন্তা-শূন্য ভাবে বিচারের ফলে বাসনার ক্ষয় হয়, বাসনার নাশ হলেই মন শান্ত হয় ।। (১৭)।। যিনি বাসনাসমূহ ত্যাগ করে' আত্মনিষ্ঠ হতে পারেন তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করেন ।। (১৮)।।

সমস্ত বাসনা ত্যাগ হয়ে যাওয়ার ফলে সাধকের যে স্বাভাবিক মৌন অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহা অতি সুখকর স্থিতি ।। (২১)।। যতকাল চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাদের নিজ নিজ বিষয় রূপ রসাদির প্রতি আকৃষ্ট হয় ততকাল বাসনা নষ্ট হয়নি বুঝতে হবে ।। (২২)।। কিন্তু, বিনা

চেষ্টায় চোখের সামনে উপস্থিত হলে যিনি জিনিষটি দেখেই ক্ষান্ত হন, সেই বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেন না, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর মন শান্ত হয়েছে ।। (২২) ।।

একমাত্র আত্মতত্ত্বের চিন্তার দ্বারা যতকাল না মনকে সম্পূর্ণভাবে বশ করা না যায়, ততকাল মনে নানা বাসনার উদয় হবে এবং নানা অশান্তির সৃষ্ঠি করবে । ।। (৪০) ।। ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত এবং মনকে বশীভূত করতে পারলে আর মনে ভোগ বাসনার উদয় হয় না ।। (৪১) ।।

বাসনাসমূহের মধ্যে, কতকগুলি মলিন এবং কতক-গুলি শুদ্ধ। মনে মলিন বাসনার উদয় হতে থাকলে বারবার জন্ম-মরণ দুঃখ ভোগ করতে হয়; মনে কেবল শুদ্ধ বাসনার উদয় হতে থাকলে আবার জন্মগ্রহণের ভয় চলে যায় ।। ৬১ ।। মুক্তি লাভের ইচ্ছা থাকলে প্রথমে বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি বাসনাকে গ্রহণ করতে হবে ।।(৬৯)।।

———

যোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

যোগীর মন সর্বদা ঈশ্বরে থাকে,—সর্বদা আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়।

(কথামৃত—24-8-1882)

যোগীরা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য জীবাত্মা' ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

(কথামৃত—27-10-1882)

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা-পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ। তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বক টানে না। মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে।

(কথামৃত—16-12-1883)

যোগ সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়; তারপর সমাধি।

(কথামৃত—16-12-83)

যোগীরা ষট্‌চক্র ভেদ করে' তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন করে। ....ষট্‌চক্র কি রকম জানো? সূক্ষ্ম দেহের ভিতর সব পদ্ম আছে। যোগীরা দেখতে পায়। যেমন মোমের গাছের ফল পাতা।

(কথামৃত—20-12-1883)

মোটামুটি দুই প্রকার যোগ—কর্মযোগ আর মনোযোগ—কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

(কথামৃত—2-2-1884)

যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পৌঁছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

(কথামৃত—2-3-1884)

যোগের বিঘ্ন কামিনী-কাঞ্চন। এই মন শুদ্ধ হলে যোগ হয়। মনের বাস কপালে (আজ্ঞাচক্রে); কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে। সাধন করলে ঐ মনের ঊর্ধ্ব দৃষ্টি হয়।

(কথামৃত—9-3-1884)

যোগী নাদ ভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়।

(কথামৃত—23-6-1884)

যোগী দুরকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না।

(কথামৃত—21-9-1884)

দীপশিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মতো যেখানে হাওয়া নাই। ....একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হলে আর খবর যাবে না।

(কথামৃত—11-10-1884)

বেদান্ত বচন

কঠ-উপনিষদের ১/২/১২ মন্ত্রে 'অধ্যাত্মযোগধিগমেন' পদটি আছে। 'অধ্যাত্মযোগ' শব্দের অর্থ, বিষয়চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে আত্মার স্বরূপ ধ্যানে নিযুক্ত রাখে। মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ। আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও তাঁকে অনুভব করা কষ্টসাধ্য। আত্মাকে অধ্যাত্মযোগ অবলম্বনে ধ্যানের ফলে অনুভব করতে পারলে মানুষ আর ভোগের বিষয় পেলে নিজেকে সুখী, অথবা না পেলে দুঃখী মনে করে না।

কঠ-উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর ১০ ও ১১ মন্ত্রে যোগের কথা বলা হয়েছে। যখন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি বিষয় ভোগের আকর্ষণ অনুভব করে না, মনেও কোন চাঞ্চল্য আসে না সেইটি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ইন্দ্রিয় সকলের এই প্রকার শান্ত অবস্থার নাম যোগ। এই অবস্থায় মানুষ আর কোন মন্দ কাজ করে না।

মুণ্ডক উপনিষদের ৩/২/৬ মন্ত্রে সন্ন্যাসকে যোগ বলা হয়েছে। সন্ন্যাস বলতে, সকল বিষয়চিন্তা ও বিষয়কর্ম ত্যাগ করে' একমাত্র ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন থাকা। ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ বলা যায়। মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ। বেদান্ত একান্ত অধ্যয়নের ফলে যাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং যাঁদের চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, তাঁরা সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন করেন। শরীর থাকতে থাকতেই তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করায় দেহ নাশের পর আর তাঁদের জন্ম হয় না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ সাধনার ও তার ফলের কথা বলা হয়েছে। সেখানে অষ্টম শ্লোকে যোগ সাধনার এইরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। —পিঠ ঘাড় ও মাথা সোজা করে বসতে হবে। এই ভাবে বসে মন এবং ইন্দ্রিয়সকল সংযত করতে হবে। একাগ্র চিত্তে ওঁকার মন্ত্র জপ ও মন্ত্রের অর্থ চিন্তা দ্বারা বিবেকী ব্যক্তি বারবার জন্ম-মরণের দুঃখ ভোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবেন।

নবম মন্ত্রে প্রাণায়াম অভ্যাসের উপদেশ এবং দশম মন্ত্রে যোগ-সাধনার উপযুক্ত স্থানের কথা বলা হয়েছে।

১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে যোগ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। ১১শ শ্লোকে যোগসাধনায় অগ্রগতির ফলে শরীরে ও মনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

যে সকল রূপ দর্শন হয় তার বর্ণনা আছে। ১২শ শ্লোকে যোগসাধনার ফলে যোগীর পঞ্চভূত নির্মিত শরীরের যে সকল পরিবর্তন হয়, তা' বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে যোগসাধনার ফলে যোগীর দেহে প্রকাশিত অন্যান্য শুভ লক্ষণের বর্ণনা আছে।

সত্য

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী-মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে, 'অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে সেসব রক্তমাখা হ'য়ে গেছে। সাধুদের শুদ্ধ জিনিষ দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিষ দিতে নাই। সত্য পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।'

(কথামৃত—December, 1882)

বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? 'সত্য বচন, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান। 'এইসে হরি ন মিলে তুলসী ঝুট জবান।।' সত্যতে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে এখানে আসবে কিন্তু এলো না।

(কথামৃত—(26-3-1883)

সত্য বলাই কলির তপস্যা সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।

(কথামৃত—26-11-1883)

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ....রামের বাড়ী গেলুম কলকাতায় বলে' ফেলেছি, লুচি খাব না। যখন খেতে দিল, তখন আমার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাব না বলেছি; তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই।

(কথামৃত—5-4-1884)

যারা বিষয় কর্ম করে—আফিসের কাজ, কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত।

(কথামৃত—1-1-1883)

বেদান্ত বচন

মুণ্ডক উপনিষদের ৩/১/৫ মন্ত্রে আত্মদর্শনের যে চারটি সাধনের বিধান দেওয়া হয়েছে, সে সকলের মধ্যে সত্যকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রটির ভাবার্থ এই রূপ—মানুষের দেহের মধ্যে জ্যোতির্ময় আত্মা প্রকাশ পান। সবরকম মানসিক মলিনতারহিত যত্ন পরায়ণ সাধকগণ এই আত্মাকে দর্শন করে' থাকেন। আত্মার স্বরূপ অনুভবের চারিটি সাধন। যথা, সত্য (মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা চিন্তা করা ত্যাগ করা), তপস্যা (ইন্দ্রিয় সমূহের এবং মনের একাগ্রতা), জ্ঞান (আত্মার স্বরূপ শাস্ত্র থেকে এবং গুরু মুখে জেনে রাখা), আর ব্রহ্মকর্ম (মৈথুন আচরণ এবং মৈথুন চিন্তা ত্যাগ)। এই সাধন

চারিটি নিত্য অর্থাৎ সকল সময় ধরে রাখতে হবে, মাঝে মাঝে ছেড়ে দিলে চলবে না।

এই উপনিষদের পরবর্তী মন্ত্রে (৩/১/১০) আছে 'সত্যমেব জয়তি নানৃতম্' সত্যেরই জয় হয়ে থাকে মিথ্যার জয় হয় না।

কেন উপনিষদের ২/৪ মন্ত্রে 'সত্যম্' পদটি সফল ব সার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রটির অর্থ এই রূপ। এই জীবনেই যদি আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানতে পার, তাহলে জন্ম সার্থক হলো। আর বেঁচে থাকতে থাকতে আত্মা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, এই তত্ত্ব যদি উপলব্ধি করতে না পার' তাহলে বারবার জন্মমরণ দুঃখ ভোগ করতে হবে। বিচারশীল ব্যক্তিরা জগতের সকল প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করেন; এবং এই প্রকার অনুভবের ফলে তাঁরা সংসার সুখ ভোগে বিরত হয়ে এই জীবনে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন ও পরমানন্দের অধিকারী হন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীর প্রথম অনুবাকে আছে, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।' ব্রহ্মের তিনটি লক্ষণের একটা হচ্ছে সত্য। যাহা ত্রিকালাবোধিত অর্থাৎ যাহা অতীতকালে যেমন ছিল, বর্তমানকালে তেমনি আছে, আর ভবিষ্যতে তার কোনও পরিবর্তন হবে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১/১৫ মন্ত্রে আত্মদর্শনের জন্য সাধনার বিধান দেওয়া হয়েছে। তিলে তৈল আছে

কিন্তু তেল পেতে হলে তিলকে পেষণের দরকার। দধিতে ঘৃত আছে; ঘি পাওয়ার জন্য দধিকে প্রথমে মন্থন করলে মাখন পাওয়া যাবে। মাখনকে আগুনে গরম করলে ঘি তৈয়ারি হবে। অরণি কাঠে আগুন আছে; কিন্তু দুটি কাঠ জোরে ঘষলে তবে আগুন মেলে। মাটির মধ্যে জলের স্রোত আছে; সে জল পেতে হলে পরিশ্রম করে মাটি খুঁড়তে হয়। ঐরকম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শুদ্ধ আত্মা আছে। সেই আত্মাকে অনুভব করার জন্য দেহে ও ইন্দ্রিয়ে 'আমি ও আমার' বলে' যে মিথ্যা জ্ঞান আছে, তাহা দূর করতে হবে। এই অজ্ঞান দূর করে' আত্মদর্শনের সাধনা হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যা। সত্যকে কায়মনোবাক্যে ধরে থাকতে হবে। ইহা বড় সহজ সাধনা নয়। দেহের আচরণে কোন অযথার্থ চেষ্টা প্রকাশ পাবে না; মনে কোন মিথ্যা চিন্তা স্থান পাবে না, মুখ দিয়ে কোন অযথার্থ বাক্য উচ্চারিত হবে না। সত্যনিষ্ঠা ও সাধনার ফলে মন শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধ মনে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

কর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

প্রসাদ বলে, ...'ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' ধর্মাধ
কি জান ? এখানে ধর্ম মানে বৈধী কর্ম। যেমন দা
করতে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙালী ভোজন এই সব। এ ধর্মবে
বলে কর্মকাণ্ড। এ বড় কঠিন পথ। নিষ্কাম কর্ম কর
বড় কঠিন।

(কথামৃত—11-10-1884

কর্ম ভাল। জমি পাট করা থাকলে যা রইবে, তা
জন্মাবে। তবে, কর্ম নিষ্কাম ভাবে করতে হয়।

(কথামৃত—14-12-1884

কর্মযোগ মানে কি জান ? সকল কর্মের ফল ভগবানে
সমর্পণ করা।

(কথামৃত—18-10-1885

সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগা
হয় নাই তাদের সংসার ত্যাগ নয়। ....তারা নিষ্কা
কর্ম করবার চেষ্টা করবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল
ভাঙবে। বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কর্ম করে

কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। এরই নাম ত্যাগ।

(কথামৃত—22-4-1883)

কর্মকাণ্ড আদি কাণ্ড। সত্ত্ব গুণ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কর্মের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশি কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। ....তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই তোমার প্রকৃতিতে তোমাকে কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর, আর নাই কর। তাই বলেছে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। কি না, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারি কঠিন। ....মনে করছি, অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে' পড়ে, জানতে দেয় না।

(কথামৃত—15-6-1884)

কর্মযোগ বড় কঠিন। কর্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়—সিদ্ধাই হয়।

(কথামৃত—1-10-1884)

যারা আশ্রমে আছে তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী কাম্য কর্মের ত্যাগ করবে; কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হয়ে করবে। দণ্ড ধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ—

এসব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। ....পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে, সে লোকশিক্ষার জন্য।

কর্ম কতদিন ? যতদিন দেহজ অভিমান থাকে অর্থাৎ দেহই আমি' এই বুদ্ধি থাকে।

কর্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অনুগত প্রাণ।—সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই।

(কথামৃত—2-10-1884)

কর্ম ত্যাগ করবে কেন ? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম-গুণ-গান, নিত্য কর্ম, এসব করতে হবে। (সংসারের কর্ম, বিষয় কর্ম) তাও করবে, সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। ....প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম নিষ্কাম-ভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর; আমার বিষয় কর্ম কমিয়ে দাও। কেন না, ...বেশি কর্ম জুটলে তোমাকে ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে।

(কথামৃত—(21-10-1884)

কর্ম করতে গেলে একটা বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে যে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক ঘড়া মোহর আছে, এই বিশ্বাস, এই জ্ঞান প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে' সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে টং

শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম করে আনন্দ বাড়তে থাকে।

(কথামৃত—26-10-1885)

বেদান্ত বচন

বেদ যে সকল যাগ, যজ্ঞরূপ কর্ম করার বিধান দেওয়া হয়েছে, সে সকল কর্মকে যথার্থতঃ কল্যাণকর বলে যাঁরা প্রশংসা করেন, মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/৬) সে সকল ব্যক্তিকে বিবেকহীন বলা হয়েছে। ঐ সকল যাগ বা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ষোল জন পুরোহিত, যজমান এবং যজমান পত্নী—এই আঠার জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এঁদের সকলেরই মরণ হয়। মরণের পর যজমান ও তাঁর স্ত্রী কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে জরা মরণের দুঃখ ভোগ করতে হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে 'কর্ম' শব্দটি পাওয়া যায়। ৩য় মন্ত্রে বলা হয়েছে—যে পরমেশ্বর সকল সময় এই জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি সর্বজ্ঞ কালকেও তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি সকল কল্যাণ-গুণ সম্পন্ন, তাঁরই ইচ্ছায় সকল ভালমন্দ কর্ম হয়ে থাকে, তাঁরই ইচ্ছায়, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত জগৎ-

রূপে প্রকাশ পায়। অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে হলেও দড়ি থাকে; সেই স্থানে পরমেশ্বর নিজে জগৎরূপে বিবর্তিত হয়ে থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা চিন্তা করবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে, সাধক প্রথমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করবেন, পরে আসক্তি নাশ হলে কর্মত্যাগ করবেন। তারপর পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহংকার—প্রকৃতির এই আটটি গুণের একটি, দুটি, তিনটি অথবা আটটি গুণ অবলম্বন করে' অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম গুণসমূহের সহায়ে এজন্মে বা পরজন্মে ঈশ্বরের সহিত আত্মার অভেদ-ভাব উপলব্ধি করবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে যে কথা বলা হয়েছে চতুর্থ মন্ত্রে সেই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে। যে সাধক প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের বশে কর্ম করতে করতে শুদ্ধ চিত্ত হন, তিনি সকল কর্ম পরমেশ্বরের আরাধনা মনে করেন। তিনি প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন পদার্থসকল সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয় বলে অনুভব করেন। এই প্রকার দর্শনের তিনি যে সকল ভালমন্দ কাজ করেছেন সে সকলের প্রভাব থেকে মুক্ত হন; নিজেকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বোধ করেন। দেহ নাশের পর তাঁকে আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

মুণ্ডক উপনিষদের ৩/১/৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে, কোনও প্রকার কর্মের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। মন্ত্রটির

অর্থ :—চোখ দিয়ে ব্রহ্মকে দেখা যায় না, বাক্য দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না, তপস্যা অথবা অন্য কোন প্রকার কর্মের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না। একান্ত চিত্তে ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধি যখন নির্মল হয়, সেই শুদ্ধ চিত্তে নিরলস ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/৪/১৫) আছে—যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্বরূপ না জেনে, 'আমি ব্রহ্ম' ইহা অনুভব না করে' মারা যান, তা হলে' সেই ব্যক্তি স্বরূপতঃ শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত আত্মা হলেও তাঁর শোক মোহ দূর হয় না; আবার জন্ম গ্রহণ করে' শোক মোহ দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকেন। যদিও তিনি জীবনে অনেক পুণ্যজনক কর্ম করেন তথাপি সে কর্মের ফল কালে ক্ষয় হয়ে যায়—কর্ম কখনও মুক্তির কারণ হয় না। অতএব, আত্মার স্বরূপ ধ্যান-রূপ কর্ম করবে। এই কর্মের ফল নষ্ট হয় না।

ফলের কামনা করে' কাজ করলে মানুষকে বারবার জন্ম মরণ দুঃখ ভোগ করতে হয় এ কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে (৪/৪/৬)। এ অংশের অর্থ এই-রূপ :—মানুষ সেই বিষয় পায় যে বিষয়ের জন্য তার মনে প্রবল বাসনার উদয় হয়। মানুষ এই জীবনে যে সব কাজ করে মরণের পর পরলোকে সে সব কর্মের ফল ভোগ করার পর কর্ম করার জন্য আবার জন্ম গ্রহণ

করে। যে ব্যক্তির মনে কামনা বাসনা থাকে তাকে এইরূপে বারবার যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু যিনি কোন কামনার বশীভূত হন না, যাঁর সকল কামনা পূর্ণ হয়েছে, যাঁর মনে কোনও কামনার উদয় হয় না, যাঁর কর্মপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়েছে, মত্যুকালে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর পরলোকে যায় না। তাঁর পৃথক ব্যক্তিসত্তা লোপ পায়, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (বৃ. ৫/৪/৬)

———

সন্ন্যাস

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার জন্য মনের যা ক্ষতি হয় তা আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তার পর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়ে মানুষের আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়? পুরুষ জানতে পারে না। (কথামৃত—15-6-1883)

সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকদের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না····স্ত্রীলোক যদি, খুব ভক্তও হয়—তবুও মেশামেশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোকশিক্ষার জন্য ত্যাগীকে এসব করতে হয়। সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে। তা না হলে তারা পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু। (কথামৃত—24-2-1883)

যে সংসার ত্যাগ করেছে সে অনেকটা এগিয়েছে।··

(কথামৃত—30-12-1883)

সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের সংসার ত্যাগ নয়।··তারা নিষ্কাম কর্ম করবার চেষ্টা করবে।··এরই নাম মনে ত্যাগ। সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুইই করবে।

(কথামৃত, 22-4-1883)

সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে তা হলেই ভয়। কামিনী কাঞ্চন ভোগ। যেমন থুতু ফেলে থুতু আবার খাওয়া। টাকা কড়ি, মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয় সুখ—এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করা ভাল নয়—নিজেরও ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না; লোক-শিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোকশিক্ষার জন্য।

মেয়েদেয় সঙ্গে বসা বা বেশিক্ষণ আলাপ তাকেও রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছে, শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে; ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছে, ও এক রকম রমণ। মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছে, ও এক রকম; মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে দিয়েছে, আনন্দ হচ্ছে; ও এক রকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই গুরু পত্নী যুবতী বলে পদস্পর্শ করতে নাই। সন্ন্যাসীর এইসব নিয়ম। (কথামৃত—5-2-1885)

বেদান্ত বচন

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ মন্ত্রে আছে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং সন্ন্যাসের চিহ্ন গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার না করলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। এটি একটা সাধারণ নিয়ম। প্রাচীন কালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেতো। কোন কোন রাজা এবং নারী সন্ন্যাস গ্রহণ এবং গেরুয়া কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার না করেও আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

পরবর্তী ষষ্ঠ মন্ত্রে আছে, যেসব সন্ন্যাসী বেদান্ত অনুশীলনের ফলে যাঁদের নিজেদিগকে আত্মা বলে বিশ্বাস জন্মেছে, তাঁরা সন্ন্যাসযোগ-অবলম্বনে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন। সন্ন্যাসযোগ বলতে বোঝাচ্ছে, সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে সকল সময় ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে থাকা।

সন্ন্যাস সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪-৪-২২) বলা হয়েছে,—সাধনকালে সন্ন্যাসিগণ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে' পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করতেন। সাধারণ মানুষের মনে তিনটি প্রবল বাসনা থাকে। বাসনা তিনটি হচ্ছে—পুত্র সন্তান, উৎপাদন, ধনসম্পত্তি সংগ্রহ ও সঞ্চয় এবং মরণের পর স্বর্গ-সুখ ভোগ (পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা), যাঁরা সন্ন্যাসী হতেন তাঁরা সংসার ত্যাগের পূর্ব বিচার করে'

দেখতেন, উক্ত তিনটি কামনা পূরণের ফলে আত্মানুভব হতে পারে না।

জাবাল উপনিষদে সন্ন্যাস গ্রহণের এই প্রকার বিধান আছে। সাধারণ বিধি ছিল—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরু-গৃহবাস সমাপ্ত করে গৃহস্থ হবে; তার পরে বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবে। প্রথম তিন আশ্রমের যে কোনটি থেকে সন্ন্যাসী হওয়া যেতে পারে। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে বৈরাগ্য। যখন রূপরস্যাদি বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণা আসবে তখন সংসার ত্যাগের সময় উপস্থিত হয়।

আরুণিক উপনিষদে সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম পাওয়া যায়। যিনি সন্ন্যাস হবেন তাঁকে কাম-ক্রোধ-লোভ-হর্ষ-মোহ-দম্ভ-দর্প অসূয়া-অহংকার এবং কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতে আমার বোধ ত্যাগ করতে হয়। তিনি 'আমি ত্যাগ করলাম' এই বাক্য তিন বার উচ্চারণ করে' সকল রকম ভোগ বাসনা ত্যাগ করবেন। তিনি সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান করবেন। তিনি ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ এবং সত্য এই সকল ব্রত যত্নের সহিত পালন করবেন।

পরমহংস উপনিষদে সন্ন্যাসীকে সকল প্রকারের কাম কাঞ্চন ত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে। তিনি কোনও প্রকার ভোগের বিষয়ে লোভ করবেন না, গ্রহণ করবেন

না, বা ভোগ করবেন না। যদি করেন তা হলে মহাপাপ করবেন।

সন্ন্যাস উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে এই সকল শ্রেণীর মনুষ্যের সন্ন্যাসে অধিকার নাই বলা হয়েছে। যথা, নপুংসক, বিকলাঙ্গ, স্ত্রৈণ, বধির, মূক, সদাচার হীন, বুদ্ধিহীন, জীবিকার জন্য ভেকধারী প্রভৃতি।

পাপ পুণ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী

(পাপ পুণ্য) আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব রেখে দেন, তা' হলে ভেদ বুদ্ধি ও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু একজনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভালমন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো, আমার পাপপুণ্য জ্ঞান সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমন করছি। কিন্তু অন্তরে জান ওসব কথা মাত্র; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ্‌-ধুগ্‌ করবে। (কথামৃত—28-11-1883)

পাপপুণ্য আছে কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই আছে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টিই এই রকম—ভালমন্দ, সৎ অসৎ। যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আম গাছ, কোনটা কাঁঠাল গাছ, কোনটা আমড়া গাছ। (কথামৃত,—15-6-1883)

এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কা মরিচ খেলে পেট জ্বালা করবেই করবে। তিনিই বল্লে

দিয়েছেন যে খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই ফলটি পেতে হবে।

যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে; ঈশ্বরদর্শন করেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে 'সা রে গা মা' এসে পড়ে। (কথামৃত—21-12-1883)

বেদান্ত বচন

মানুষের শরীরের মধ্যে যে বায়ু আছে তার কাজের পার্থক্য অনুসারে প্রাণ, অপান, উদান ও ধ্যান, এই পাঁচটি নাম আছে। এদের মধ্যে উদান বায়ুর গতি পদতল থেকে মস্তক পর্যন্ত। আর, মানুষের শরীরে যে একশত একটা প্রধান নাড়ী আছে তাদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ থেকে মস্তক পর্যন্ত গিয়েছে। মানুষের মরণকালে উদান বায়ু সুষুম্না নাড়ী দিয়ে জীবের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরকে, জীবনে যে পুণ্য কর্ম করে তাকে স্বর্গে, পাপ কর্মকারীকে নরকে অথবা হীনযোনিতে এবং পাপ-পুণ্য সমান তাকে মনুষ্যযোনিতে নিয়ে আসে। [প্রশ্ন উপনিষৎ (৩।৭)]

মানুষ স্বপ্ন দেখার সময় ভালমন্দ নানারকম কাজ করে থাকে বলে' মনে করে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সে নানারূপ কাজের দৃশ্য দেখে থাকে মাত্র; দেহ বা

ইন্দ্রিয় দিয়ে কিছু করে না। ঐ সব দেখার ফলে তার পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না—

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪-৩-১৬

কোন গাছে ফুল ফুটলে সেই ফুলের সুগন্ধ যেমন বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের পুণ্য কর্মের কথা বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মহানারায়ণ উপনিষৎ—অষ্টম খণ্ড।

মহানারায়ণ উপনিষদের চতুর্দশ খণ্ডে আছে, অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে পাপ হয়, অনুচিত কর্ম করলে পাপ হয়। এই উপনিষদের উনবিংশতি খণ্ডে এই সব কাজ পাপজনক বলা হয়েছে, চুরি করা অন্ন, বেশ্যা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের দেওয়া অন্ন ভোজন, গোরু চুরি, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীর সহবাস, মদ্যপান।

কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে,—মাতৃহত্যা, পিতৃবধ, ভ্রূণ হত্যা করলে পাপ হয়। চুরি করলে পাপ হয়।